# চক্ষে আমার তৃষ্ণা

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

# সূচিপত্র


১. তরু তার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে.....2

২. তরু উপন্যাস লেখা শুরু করেছে.....20

৩. ঢাকা শহরে বৃষ্টি.....32

৪. তরু আজ আবার উপন্যাস নিয়ে বসেছে.....47

৫. তরু বসে আছে.....64

৬. তরুর লেখা ডায়েরি.....89

৭. জামান বারান্দায় মোড়ার উপর.....100

৮. বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর.....119

৯. ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে.....130

১০. কাগজ ছেঁড়ার শব্দ.....148

# ১. তরু তার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে

উৎসর্গ

আমার হৃদয় নামক পাম্পিং মেশিনে কিছু সমস্যা হয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্যে আমাকে মাঝে মাঝে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালে যেতে হয়। তখন এক প্রবাসী গল্পকার। ছুটে আসেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আমাকে কিছুটা স্বস্তি দিতে।

শহীদ হোসেন খোকন

স্বস্তিকারকেষু

-----

০১.

তরু তার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তার পানির পিপাসা পাচ্ছে। বুক ধকধক করছে। শব্দটা এত জোরে হচ্ছে যে, তরুর মনে ক্ষীণ সন্দেহ হলো, বেতের চেয়ারে বসা বাবাও শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন। এক্ষুনি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করবেন, হাতুড়ি পেটার শব্দ কে করে? What sound? ভুল-ভাল ইংরেজি বলা তার স্বভাব।

তরুর বিচারসভা বসেছে। সে ভয়ংকর একটা অন্যায় করে ধরা পড়েছে। শাস্তি হবে এটা জানা কথা। শাস্তির জন্যে তার কোনো ভয় লাগছে না। শাস্তি আর কি হবে? ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েকে কোনো বাবা মারধর করে না। একটা চড় হয়তো গালে দেবেন। শাস্তির চেয়ে চড় খাবার লজ্জাটাই হবে প্রধান।

তরুর ভয় করছে অন্য কারণে। বাবা বলে বসতে পারেন, তুমি উচ্ছন্নে যাচ্ছ। তোমাকে আমি পুষব না। কোনো একটা ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেব। নষ্টামি যা করার জামাইয়ের বাড়িতে গিয়ে করো। বদ মেয়ে! Super naughty girl.

তরু মোটেই বদ মেয়ে না। তার ধারণী সে খুবই ভালো মেয়ে। ভয়ংকর অন্যায় সে যা করেছে অন্য কোনো বাবার কাছে এটা হয়তো অন্যায় বলেই মনে হবে না। তার বাবার কাছে সবই অন্যায়। টিভি দেখা অন্যায়। শব্দ করে গান শোনা অন্যায়। রাত এগারোটার পর জেগে থাকা অন্যায়। পরীক্ষায় খারাপ করা অন্যায়। গল্পের বই পড়া অন্যায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকা অন্যায়।

শামসুন নাহার!

তরু ক্ষীণ গলায় বলল, জি বাবা।

শামসুন নাহার, তরুর ভালো নাম। তরুর বাবা আব্দুল খালেক মেয়েকে নিয়ে বিচারসভা বসালে ভালো নামে ডাকেন।

তোমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে যে বস্তু পাওয়া গেছে তার নাম কী? Toll me name.

সিগারেটের প্যাকেট।

এই সিগারেটের প্যাকেট তুমি কিনেছ?

না বাবা, এটা একটা বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট। দেশে কিনতে পাওয়া যায় না। একেকটা সিগারেট একেক রঙের। প্যাকেট খুলে দেখাব?

প্যাকেট খুলে দেখানোর প্রয়োজন দেখছি না। এই সিগারেট তোমাকে কে দিয়েছে? Who gave?

তরু জবাব দিল না। সত্যি কথাটা বলা ঠিক হবে কি-না বুঝতে পারছে না। সিগারেটের প্যাকেটটা তাকে জন্মদিন উপলক্ষে দিয়েছে আয়েলিতা। অয়েলিতা তার অতি অতি প্রিয় বান্ধবী। আয়েলিতার বাবা থাকেন ইতালির মিলান শহরে। যতবারই দেশে আসেন ম্রায়েলিতার জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস নিয়ে আসেন। তার কিছু কিছু আয়েলিতা তরুকে দেয়। এবার দিয়েছে সিগারেটের প্যাকেট এবং একটা লাইটার। লাইটারটা দেখতে ফুটবলের মতো। চাপ দিলেই হুস করে আগুন বের হয়।

খালেক সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, সিগারেটের প্যাকেট তোমাকে কে দিয়েছে বলছ না কেন? যে দিয়েছে তার নাম বলো। টেলিফোন নাম্বার বলো। আমি তার সঙ্গে এবং তার বাবা-মার সঙ্গে কথা বলব। নাম বলো। খাম্বার মতো দাঁড়ায়ে থাকবে না। তুমি খাম্বা না। You are not pillar.

তরু বলল, ওসমান চাচা দিয়েছেন।

বলতে বলতেই সে মেঝে থেকে চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাল। সে জানে ওসমান চাচার প্রতি বাবার বিশেষ দুর্বলতা আছে। বাবার ধারণা এই মানুষটা পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। শুধু তাই না, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ। এই মানুষটার উপর রাগ করা তার

বাবার পক্ষে অসম্ভব। উনি কোনো অন্যায় কাজ করলেও বাবার কাছে মনে হবে এই অন্যায়ের মধ্যেও কিছু-নাকিছু ন্যায় অবশ্যই আছে।

ওসমান সাহেব দিয়েছেন?

হুঁ। তাকে তাঁর এক ছাত্র পাঠিয়েছে। উনি তো সিগারেট খান না টেবিলে রেখে দিয়েছেন। রঙ-চঙা প্যাকেট দেখে আমি ভাবলাম চকলেট। আমি বললাম, চাচা এটা কি চকলেট চাচা বললেন, না গো মা। সিগারেট। পার্টি সিগারেট। বিদেশের মেয়েরা পার্টিতে ফুকে। তামাক ছাড়া সিগারেট। তুমি নিয়ে যাও।

খালেক সাহেব কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলালেন। কপালে ভান হাতের তর্জনি দিয়ে কিছুক্ষণ ঘষলেন। খুকখুক করে কাশলেন। তরু তার বাবার প্রতিটি লক্ষণ চেনে, বাবা কথা খুঁজে না পেলে এরকম করেন।

মনে হচ্ছে খালেক সাহেব কথা খুঁজে পেয়েছেন। মাথা ঝাঁকিয়ে খানিকটা ঝুঁকে এসে ডাকলেন, তরু!

তরু স্বস্তি পেল। ভালো নাম থেকে ডাকনামে চলে এসেছেন। কাজেই তিনি এখন স্বাভাবিক। সিগারেট সমস্যা মনে হয় মিটে গেল। তরু মিষ্টি গলায় বলল, জি বাবা।

তুমি ওসমান সাহেবের স্বভাব জানো না? তুমি কি জানো না তার ঘরের যে কোনো জিনিস নিয়ে তুমি যদি আগ্রহ দেখাও তাহলে সেটা তিনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন। জানো কি জানো না? You know or not know?

জানি।

এই স্বভাব জানার পরেও তোমার মতো একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে কী করে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে আহ্লাদী করলে?

আহ্লাদী করি নাই বাবা। আমি শুধু বলেছি, চাচা এটা কি চকলেট?

এটা বলাই আহ্লাদী। তুমি কি জীবনে চকলেই দেখো নাই?

বাবা আমি কি উনাকে প্যাকেট ফেরত দিয়ে আসব?

একটা বোকামি করেছ এটাই যথেষ্ট। দুটো বোকামি করবে না। সিগারেট ফেরত দেয়া মানে উনাকে অপমান করা! Do you understand?

তরু বলল, Yes sir.

এমন ভঙ্গিতে বলল যে, খালেক সাহেবের কাঠিন্য পুরাপুরি চলে গেল। হেসে ফেলতে যাচ্ছিলেন, অনেক কষ্টে হাসি থামালেন।

তরু বলল, বাবা তুমি কি আমাকে আরো বকবে?

খালেক সাহেব বললেন, কলাম কখন? সামান্য ওয়ার্নিং। আমাকে এক কাপ চা খাওয়া। চিনি দিবি না। লিকার হালকা।

তরু বলল, Tea is coming sir.

এইবার খালেক সাহেব সত্যি সত্যি হেসে ফেললেন। তবে তিনি খুশি যে, তার মেয়ে এই হাসি দেখে নি। আগেই ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের সামনে গাম্ভীর্য রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। আজকালকার বাবাদের কাণ্ড দেখলে তার শরীর চিড়বিড় করে। ছেলেমেয়েরা বাবার গায়ে হাত রেখে কথা বলে। যেন বাবা তাদের ইয়ার-বন্ধু। অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখার কুফল ছাড়া আর কিছু না। টেলিভিশন পুরোপুরি বন্ধ করে রেডিওর জগতে চলে যেতে পারলে ভালো হতো। রেডিওর যুগে সভ্যতা জ্ঞান ছিল। মান্যগন্য ছিল।

এই নাও বাবা চা।

খালেক সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এত তাড়াতাড়ি চা কীভাবে বানালি?

তরু বলল, কেটলিতে ফুটন্ত পানি ছিল, আমি একটা টি-ব্যাগ ফেলে নিয়ে এসেছি। তুমি তো চায়ে চিনি-দুধ কিছুই খাও না।

খালেক সাহেব চায়ের চাপ হাতে নিলেন। মেয়েটার উপর থেকে সব রাগ চলে গেছে। এখন উল্টো নিজের কঠিন কথাবার্তার জন্য মনটা খারাপ লাগছে। বেচারির তো দোষ নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাবার ট্রেনিং এই মেয়েকে দেয়া হয় নি।

বাবা এই নাও সিগারেট। প্লীজ একটা খাও।

তরু তার রঙিন সিগারেটের প্যাকেট খুলে বাবার দিকে ধরে আছে। খালেক সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সিগারেট খাব?

মেয়েদের সিগারেট। একটা খেয়ে আমাকে বলে খেতে কেমন। প্লিজ বাবা।

খালেক সাহেব সিগারেট নিলেন। তরু লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল। চোখ বড় বড় করে বলল, বাবা খেতে কেমন?

খারাপ না। তুই বলেছিলি তামাক নেই। তামাক আছে।

আমি বলি নি বাবা। ওসমান চাচা বলেছেন। আমি উনাকে ধরব।

উনাকে ধরার কিছুই নেই। উনি তো আর খেয়ে দেখেন নি। অনুমানে বলেছেন। তামাক আছে তবে পরিমাণে সামান্য। না থাকার মতই। very small quantity.

খেতে ভালো লাগছে বাবা?

খালেক সাহেব দুরাজ গলায় বললেন, তোর খুব ইচ্ছা করলে একটা খেয়ে দেখ।

সত্যি খেয়ে দেখব? পরে আমাকে প্রবে না তো বাবা?

আমার সামনে ধরাবি না।

ওসমান চাচার সামনে ধরাই। উনার জিনিস উনার সামনে খেলে উনি খুশিই হবেন।

খালেক সাহেব জবাব দিতে পারলেন না। মেয়েটা মাঝে মাঝে এমন বিপদে ফেলে।

ওসমান সাহেব তরুদের বাড়ির ছাদে তিনটা ঘর নিয়ে থাকেন। তিনি তরুকে ডাকেন মিস্ট্রি। এই নামকরণ তরুর স্বভাব লক্ষ করে না। তরু অর্থ গাছ, ইংরেজিতে ট্রি। মিস তরু থেকে মিস ট্রি। সেটা সংক্ষেপ করে মিস্ট্রি। তরু এই নামের বদলা নেবার চেষ্টা করেছে, ওসমান সাহেবকে ছাচা ডেকেছে। ছাদের চাচা থেকে ছাচা। তরু কিছুদিন এই নামে ডেকে হাল ছেড়ে এখন চাচা ডাকছে।

ওসমান সাহেব বাস করেন হুইল চেয়ারে। তিনি জীবনযাপনের জন্য ছাদটাকে হুইল চেয়ার উপযুক্ত করে নিয়েছেন। বিছানা থেকে হুইল চেয়ারে নিজে-নিজে নামতে পারেন। ছাদে আসতে পারেন। কারোর সাহায্যে লাগে না। ছাদের তিনটি ঘরের একটায় তাঁর শোবার ঘর, একটা পড়াশোনা ঘর অন্যটা রান্নাঘর। হুইল চেয়ারে বসে তিনি চা বা কফি বানাতে পারেন। পাউরুটি টোস্ট করতে পারেন। ডিম সিদ্ধ করতে পারেন। সকালের নাশতা তিনি নিজের হাতে তৈরি করেন। একটা কলা, মাখন মাখা এক পিস রুটি এবং ডিম সিদ্ধ। সারা দিন এর বাইরে কিছুই খান না। রাতে টিফিন কেরিয়ারে করে হোটেল থেকে তার জন্যে খাবার আসে। যে ছেলেটি খাবার আনে তার নাম রফিক। বয়স বারো-তেরো। অতি কর্মঠ ছেলে। সে দেড় ঘণ্টার মতো থাকে। এর মধ্যেই ঘর পরিষ্কার করে, কাপড় ধুয়ে দেয় এবং কিছুক্ষণ পড়াশোনাও করে।

রফিকের জন্যে বাংলা বর্ণমালার বই এবং ইংরেজি ABCD-র বই কেনা আছে। পড়াশোনা সে যথেষ্ট আগ্রহ করেই চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলা যুক্তাক্ষর নিয়ে তার সামান্য সমস্যা হচ্ছে। যুক্তাক্ষর ছাড়া বাংলা সে ভালোই পড়তে পারে। বাংলার চেয়ে ইংরেজি শেখার দিকে তার ঝোঁক বেশি। প্রতিদিন দুটি করে ইংরেজি শব্দে তার শেখার কথা। রফিক তা শিখছে এবং মনে রাখছে। Night, star, sound-এর মতো শব্দগুলি এবং তার অর্থ সে জানে।

ওসমানের বয়স পঞ্চশি। কিন্তু তাকে সে রকম বয়স্ক মনে হয় না। মাথা ভর্তি চুল। চুলে পাক ধরে নি। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। নিজেকে ব্যস্ত রাখার নানা কৌশল তিনি বের করে রেখেছেন। আকাশের তারা দেখা, বই পড়া, সিনেমা দেখা, গান শুনা। ইদানীং ছবি আঁকা শেখার জন্যে বইপত্র কেনা শুরু করেছেন। চারুকলার মনিকা নামের ফোর্থ ইয়ারের এক ছাত্রী প্রতি পনেরো দিনে একবার এসে তাঁকে ছবি আঁকা শেখায়। ওসমান সাহেব তাকে মাসে এক হাজার টাকা দেন।

ভদ্রলোক বিবাহিত স্ত্রী সুলতানা আলাদা বাস করেন। তিনি হঠাৎ হঠাৎ স্বামীকে দেখতে আসেন। তাদের একটা ছেলে আছে। ছেলের নাম আবীর। বয়স আট। আবীর তার মার সঙ্গে আসে। তার প্রধান আনন্দ পেছন থেকে বাবার হুইল চেয়ার ঠেলা। চলে যাবার সময় সে খুব কান্নাকাটি করে। কিছুতেই যাবে না। ওসমান সাহেব ক্ষীণ গলায় বলেন, থাকুক না একদিন। তখন সুলতানা এমন ভঙ্গিতে তাকান যেন এমন অদ্ভুত কথা তিনি তার জীবনে শুনেন নি। প্রতিবারই আবীরকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে হয়।

সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার হাতে তরু ছাদে এসেছে। এই দুই বস্তু কালো হ্যান্ড ব্যাগে লুকানো। ওসমান ছাদে। তার সামনে পায়া লাগানো ছোট্ট টেবিল। টেবিলের উপর টেলিস্কোপের লেন্স, লেন্স ক্লিনার লোশন এর তুলা। ওসমান লেন্স পরিষ্কার করছেন। তরু বলল, চাচা আমি এখন এমন একটা কাজ করব যা দেখে আপনি চমকে যাবেন। অনুমান করুন তো কাজটা কী? ওসমান সাহেব তরুর দিকে না তাকিয়েই বললেন, তুমি একটা সিগারেট খাবে।

তরু কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। মানুষটা তরুর সিগারেটের বিষয় কিভাবে বলছে? ওসমান বললেন, কই সিগারেট তো ধরাচ্ছ না।

তরু বলল, সিগারেট থাকলে তবে তো ধরাব? চাচা আপনি আমাকে কী ভাবেন? গাঁজা-সিগারেট খাওয়া টাইপ মেয়ে? কেন শুধু শুধু বললেন, আমি সিগারেট খাব? আমাকে খারাপ ভেবেছেন, এই জন্য সরি বলুন।

সরি বলব না।

কেন বলবেন না?

আমি গতকাল সন্ধ্যায় ঘর থেকে দেখেছি তুমি ছাদে কালো ব্যাগটা নিয়ে এসেছ। ব্যাগ খুলে সিগারেট বের করে ধরিয়েছ। আগ্রহ করে ধুয়া ছাড়ছ। আমার ধারণা আজও তোমার ব্যাগে সিগারেট আছে। এখন বলো আছে না?

আছে। তবে বাবা আমাকে সিগারেটের প্যাকেট রাখার এবং সিগারেট খাবার পারমিশন দিয়েছেন। আমার কথা বিশ্বাস না করলে আপনি বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

বিশ্বাস করছি।

তরু সিগারেট ধরিয়ে কায়দা করে ধুয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আজ রাতে কি তারা দেখা হবে?

হুঁ।

তারা-ফারা দেখা খুবই ফালতু কাজ।

তুমি তো দেখছ না। আমি দেখছি।

আপনার কাছে ফালতু লাগে না?

না।

আচ্ছা চাচা আপনি আমাকে সুন্দর দেখে একটা নাম দিন তো।

কীসের নাম?

আমি একটা উপন্যাস লিখব। উপন্যাসের নাম।

উপন্যাস লিখবে?

Yes Sir, আপনার কি ধারণা আমি উপন্যাস লিখতে পারব না। যে টিচার আমাদের চর্যাপদ পড়ান তিনি বলেছেন, আমার বাংলা ঝরঝরে। আমার একটা এসাইনমেন্ট পড়ে বলেছেন।

তাহলে লেখা শুরু করে দাও। আগে নাম ঠিক করব তারপর লিখব। এক্ষুনি একটা নাম দিন তো।

কালপুরুষ নমি দাও। শীতকালের তারামণ্ডল। আকাশের মাঝখানে থাকে।

তরু মাথা ঝাকিয়ে বলল, আকাশের মাঝখানে থাকুক কিংবা সাইডে থাকুক, রা-ফারার নামে আমি উপন্যাসের নাম দেব না। তা ছাড়া আমার উপন্যাসটা হবে প্রেমের উপন্যাস। একটা মিষ্টি নাম দিন।

এসো করো স্নান নাম দেবে?

না। এসো গায়ে সাবান মাখো, করো স্নান ফালতু।

রবীন্দ্রনাথের লাইন। চট করে ফালতু বলা ঠিক না।

ফালতু বললে রবীন্দ্রনাথ রাগ করবেন?

রবীন্দ্র-ভক্তরা করবে। তা ছাড়া তুমি বাংলার ছাত্রী।

তরু বলল, আমি বাংলার ছাত্রী হই বা ফিজিক্সের ছাত্রী হই যেটা ফালতু আমি সেটাকে অবশ্যই ফালতু বলব।

ওসমান বললেন, আচ্ছা বলো।

আমি যে সত্যি উপন্যাস লিখব আপনি মনে হয় এটা বিশ্বাস করছেন না, উপন্যাস কীভাবে লিখতে হয় সব নিয়ম-কানুন আমি শিখেছি। একজন লেখকের কাছে শিখেছি। উনি বলেছেন, প্রথম উপন্যাস উত্তম পুরুষে লিখতে হবে। নিজের জীবনের কাহিনী দিয়ে শুরু। নিজের চেনা জগতে বিচরণ।

উপন্যাস লেখার মতো কাহিনী কি তোমার জীবনে আছে?

কিছু বানাব। আপনার কি ধারণা আমি লিখতে পারব? একজন ঔপন্যাসিকের যেসব গুণ থাকার কথা আমার কিন্তু তার সবই আছে। যেমন আমি খুব গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারি। গল্প বানাতে পারি। পারি না?

আমার ধারণা পারো।

উপন্যাসের প্রথম লাইনটা আমি লিখে ফেলেছি। শুনতে চান?

পুরো একটা চ্যাপ্টার লিখে ফেলো, তারপর পড়ে দেখব।

প্রথম লাইনটা শুনে দেখুন না। প্রথম লাইনটা হচ্ছে—হ্যালো। আমি আঠারো বছর বয়সের অতি রূপবতী এক তরুণী।

ওসমান বললেন, হ্যালো দিয়ে শুরু করেছ কেন? তুমি তো কাউকে টেলিফোন করছ না।

তরু বলল, ঠিক আছে, হ্যালো বাদ দিলাম। আমি আঠারো বছরের অতি রূপবতী এক তরুণী। এটা কি ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

আমি যা সত্যি তা-ই লিখছি। আসলেই তো আমি অতি রূপবতী একজন। না-কি আপনার ধারণা আমি রূপবতী না? রূপে এক থেকে দশের স্কেলে আপনি আমাকে কত দেবেন?

ছয়।

মাত্র ছয়? কী বলেন এইসব!

মেয়েদের রূপ সময়নির্ভর। একেক সময় তাকে একেক রকম লাগে। এখন তোমাকে ছয় দিলাম অন্য একদিন হয়তো দশে দশ দেব।

আবার তিন-চারও তো দিয়ে ফেলতে পারেন।

এত কম দেব না।

তরু আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। দ্বিতীয় সিগারেট ঠোঁটে দেবার আগে সে বলল, আগের সিগারেটটা আমি আরাম করে খেতে পারি নি। সারাক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম তো, এই জন্যে। এখন আর আপনার সঙ্গে কথা বলব না।

তরু ছাদের অন্য মাথায় চলে গেল।

ঘরে টেলিফোন বাজছে। ওসমান হুইল চেয়ার নিয়ে রওনা হলেন। ইদানীং টেলিফোনের ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। নির্বাসিত জীবন ঢাকার বাইরে কোথাও হলে ভালো হতো। যেখানে টেলিফোন থাকবে না, চিঠিপত্রের ব্যবস্থা থাকবে না।

হ্যালো ওসমান ভাই বলছেন?

হ্যাঁ।

আমি রাকিব, চিনতে পারছেন?

গলার স্বরেই ওসমান চিনেছেন, তারপরও বললেন, সরি চিনতে পারছি না।

ড্রাফটম্যান রাকিব। মুন্সিগঞ্জ।

ও আচ্ছা।

ওসমান ভাই। অনেক চেষ্টা করে আপনার নাম্বার জোগাড় করেছি। আপনার জন্যে ভালো খবর আছে।

বলুন শুনি।

আপনি করে বলছেন কেন? সারা জীবন তুমি করে বলেছেন। আপনি কি এখনও চিনতে পারেন নি?

চিনতে পেরেছি, বলো। ভালো খবরটা কী?

আপনার জন্য কাজ জোগাড় করেছি। শৌখিন লোক। প্রচুর টাকাপয়সা। স্পেনে থাকে। সাভারে বাগানবাড়ির মতো করেছে। দুশ বিঘা জমির বাগানবাড়ি। সেখানে সে মেডিটেশন ঘর বলে ঘর বানিতে চায়। আপনাকে দিয়ে ডিজাইন করাবে। ভাল টাকা-পয়সা দেবে। টাকার ক্রকোডাইল।

আপাতত আমি কোনো ডিজাইন করছি না। মাথায় কিছু আসছে না।

এখন আসছে না। পরে আসবে। আইডিয়া আপনার ভালো লাগবে। স্পেনের আর্কিটেক্ট গডির মতো করে সে মেডিটেশন হাউস করতে চায়, সাগ্রাদা ফ্যামিলি টেম্পলের মতো করতে চায়। এতে ম্যাসিভ না তারপরও...

ওসমান বললেন, হ্যালো হ্যালো ...

আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন না? আমি তো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি।

ওসমান নিজেও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন, তারপরও হ্যালো হ্যালো হ্যালো বলে রিসিভার রেখে দিলেন। সাগ্রাদা থাকুক সাগ্রাদার মতো। আপাতত চা খাওয়া যাক। তিনি হুইল চেয়ার নিয়ে রান্নাঘরে উপস্থিত হলেন। একবার দরজায় এসে উঁকি দিলেন। তরুর সিগারেট খাওয়া শেষ হয়েছে তবে সে এখনও ছাদেই আছে। ওসমান বললো, তরু চা খাবে?

হুঁ।

দুধ চা না-কি লিকার?

দুধ চা। আমি কড়া চা খাই। দুটা টি ব্যাগ দেবেন। আগে চা খাবার অভ্যাস ছিল না। এখন করছি। লেখকদের ঘনঘন চা খেতে হয়। কড়া লিকারের চা।

ওসমান চা বানিয়ে ছাদে এসে দেখেন তরু নেই। লেখকের একটি গুণ খেয়ালি ভাব তরুর ভেতরে আছে। ওসমান চায়ে চুমুক দিলেন। ছাদে ঘুরতে-ঘুরতে চা খাবার আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত। এক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে অন্য হাতে হুইল চেয়ারের চাকা ঘুরানো যথেষ্ট কঠিন। মোটর লাগানো হুইল চেয়ার একটা কিনলে হতো। লাখ টাকার উপরে দাম। ছাদে ঘুরতেঘুরতে চা খাবার আনন্দের জন্যে এতগুলি টাকা খরচ করা ঠিক কি-না বুঝতে পারছেন না।

আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। আজ রাতে তারা দেখা যাবে কি-না কে জানে। বাংলাদেশ তারা দেখার উপযুক্ত জায়গা না। আকাশে সব সময় মেঘ। বাতাসে প্রচুর জলীয়বাষ্প। টেলিস্কোপের লেন্সে দ্রুত ছাতা পড়ে যায়। ওসমান টেলিস্কোপের লেন্স রাখার জন্যে বড় ডেসিকেটর খুঁজছেন। পাচ্ছেন না। এই দেশে প্রয়োজনের কিছুই পাওয়া যায় না।

# ২. তরু উপন্যাস লেখা শুরু করেছে

তরু উপন্যাস লেখা শুরু করেছে। শুরুটা আয়োজন করে করা। টেবিল ল্যাম্প অফ করে সে আঠারোটা মোমবাতি জ্বালিয়েছে। তার বয়স আঠারো, এই জন্যে আঠারোটা মোমবাতী। রেডিওবন্ড কাগজ আনিয়েছে। লিখেছে ফাউনটেন পেন দিয়ে। সে লেখা শুরু করেছে রাত বারোটায়। আপাতত উপন্যাসের নাম দিয়েছে 'নিশি উপন্যাস'।

তরুর লেখা উপন্যাসের প্রথম কয়েক পাতা

আমি আঠারো বছরের রূপবতী তরুণীদের একজন। আমার নাম শামসুন নাহার খানম। ডাকনাম তরু। ক্লাসে আমার বন্ধুরা আমাকে ডাকে শসা। কেন শসা ডাকে আমি জানি না। কেন ডাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেউ বলে না, শুধু হাসে। নিশ্চয়ই বাজে কোনো কারণ আছে। সবচেয়ে বেশি হাসে আয়েলিতা। হাহা হিহি হাহা। আয়েলিতার হাসি পুরুষদের মতো। আয়েলিতার নিক নেম ছাগলের দাড়ি। শুনলে মনে হয় খারাপ কিছু না, আসলে ভয়ংকর।

আমি বাবার সঙ্গে খাকি। বিয়ে হয় নি এই জন্যে বাবার সঙ্গে থাকি। আমার ধারণা বিয়ের পরও আমি বাবার সঙ্গেই থাকব। কারণ বাবা একা। বাবার প্রথম স্ত্রী আমার বড় খালা। বিয়ের দু বছরের মাথায় তিনি হার্ট এ্যাটাকে মারা যান। তখন বাবা আমার মাকে বিয়ে করেন। আমার মা মারা যান আমার জন্মের এক বছরের মাথায়। আমার আর কোনো খলাি ছিলেন না বলে বাবা আর বিয়ে করতে পারেন নি। আমি নিশ্চিত আমার যদি আরেকজন খালা থাকতেন বাবা তাকেও বিয়ে করতেন এবং তিনিও মারা যেতেন। বাবা

তার মৃত স্ত্রীদের অত্যন্ত পছন্দ করেন। আমার মা এবং খালা দুজনেরই দুটা ওয়েল পেইনটিং পাশাপাশি সাজানো। দুজনের মৃত্যু দিনে বাড়িতে কোরানখানি হয়। মিলাদ পড়ানো হয়। বাবা মুখ শুকনা করে ঐ দুই দিন ঘরেই থাকেন কোথাও যান না। শুধু তা-না তিনি সেদিন মাওলানার কাছে তওবা করেন। তওবা অনুষ্ঠানে চোখের পানি ফেলেন।

বাবার নাম আব্দুল খালেক খান। তিনি ফালতু ধরনের ব্যবসায়ী। তার তিনটা সিএনজি ট্যাক্সি আছে। ট্যাক্সির গায়ে লেখা শামসুন নাহার পরিবহন। ট্যাক্সি ছাড়াও তার দুটি ট্রাক আছে। ট্রাকের গায়ে লেখা তরু পরিবহন। সমগ্র বাংলাদেশ সাত টন। আমরা যেখানে থাকি সেই রাস্তার শেষ মাথায় বাবার একটা মুদি দোকানের মতো আছে। মুদি দোকানের নাম শামসুন নাহার খানম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে, বাবার একটা নাপিতের দোকানও আছে। তার নাম—নাহার হেয়ার ড্রেসিং। সবই আমার নামে। বাবা যদি কোনদিন রেডিমেড হাফ শার্টের দোকান দেন তাহলে তার নামও হবে তরু রেডিমেড হাফ শার্ট।

ফালতু ধরনের ব্যবসা হলেও বাবার অনেক টাকা। কারণ তিনি অত্যন্ত হিসাবি। আমাদের বাসায় বাজে খরচ করার কোনো উপায় নেই। অনেক খ্যাখ্যান করার পর তিনি আমাকে সবচেয়ে সস্তার একটা মোবাইল কিনে দিয়েছেন। মোবাইলে কাউকে টেলিফোন করা নিষেধ। কেউ টেলিফোন করলে ধরা যাবে। বাবা আমাকে ডেকে কঠিন গলায় বলেছেন, আধুনিক বিশ্বের (বাবা কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার পছন্দ করেন) অপ্রয়োজনীয় একটি আবিষ্কারের নাম মোবাইল টেলিফোন।

আমি বলেছিলাম, কেন অপ্রয়োজনীয়?

বাবা উত্তর দিয়েছেন, কারণ এই বস্তু মানুষকে অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে উৎসাহী করে। কর্মবিমুখ করে। তুমি অবশ্যই তোমার মোবাইলের নাম্বার কাউকে দিবে না।

আমি বললাম, কাউকে নাম্বার না দিলে তারা টেলিফোন করবে কীভাবে? ঠিক আছে আমার মোবাইল লাগবে না। এটা তোমার কাছে থাকুক। আমার যখন দরকার হবে তোমার কাছ থেকে নিয়ে টেলিফোন করব।

এরপর বাবা বিরক্ত হয়ে আমাকে টেলিফোন দিয়ে দিয়েছেন। বাবা কথায় কখনও আমার সঙ্গে পারেন না। যখন পারেন না, তখন হামকি-ধামকি করেন।

আমার মোবাইল টেলিফোনের নাম্বার ০১৭৮১১৯২২৩০। আমার উপন্যাস যদি ছাপা হয়, কেউ যদি কিনে পড়েন, তাহলে আমাকে এই নাম্বারে টেলিফোন করে জানাবেন। রাত বারোটার পরে করবেন, তখন কলচার্জ কম। আমি অনেক রাত জাগি।

এখন বলি আমরা কোথায় থাকি। কলাবাগানে। বিশ বছর আগে বাবা তার এক বন্ধুর কাছ থেকে তিন কাঠা জায়গা কিনেছিলেন। সেই তিন কাঠায় বাবা দোতলা বাড়ি বানিয়েছেন। আমরা দোতলায় থাকি। বাবার ব্যবসার লোকজন ট্রাক ড্রাইভার, ট্যাক্সি ড্রাইভার, দোকানদার, নাপিত—এরা সবাই একতলায় থাকে।

একতলার দুটা কামর বাবা ভাড়া দিয়েছেন। সেখানে জামান নামে এক ভদ্রলোক তার স্ত্রী এবং শালাকে নিয়ে থাকেন। জামান সাহেব কিছুদিন পরপরই তার শালাকে মারধর করেন। শালাটার নাম সনজু। সে কলেজে পড়ে। সেকেন্ড ইয়ার। হাবা টাইপের। দুলাভাইয়ের মার খেয়ে সে হাউ হাউ করে দেতিলার সিঁড়িতে বসে কাঁদে। ছেলেটা দেখতে

সুন্দর আছে, তবে অতিরিক্ত রোগা। সে যদি আমাদের সঙ্গে পড়ত তাহলে আমি তার নাম দিতাম সুতা কৃমি।

এখন আমি আপনাদের সুতা কৃমির একটা মজার গল্প বলব। উপন্যাসের নিয়মে এই গল্প আরো পরে বসা উচিত কিন্তু পরে ভুলে যাব বলে এখনি বলছি। উপন্যাসের নিয়মে চরিত্রদের চেহারা এবং আচার-ব্যবহার কিছুটা বর্ণনা করা দরকার, যাতে পাঠক চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করতে পারে এবং কল্পনায় সে একজনকে দাড়া করাতে পারে। আমি বাবার চেহারা বর্ণনা করতে ভুলে গেছি। সুতা কৃমি সম্পর্কে শুধু বলেছি দেখতে সুন্দর। এখন দুজনের চেহারার বর্ণনা দেব। তারপর সুতা কৃমির গল্পটা বলব।

বাবা

জনাব আব্দুল খালেদ খান

বয়স চল্লিশ মিডিয়াম হাইট। মোটাসোটা। ভুড়ি আছে। মাথায় টাক। গোঁফ আছে। মোটা গোফ। গোঁফ খানিকটা পাকা। কানে লম্বা লম্বা লোম আছে। এইগুলি তিনি কখনও কাটান না। কানের লোম না-কি লক্ষ্মী, কাটতে নেই। মুখ গোলাকার। গায়ের রঙ ফর্সা। চোখে চশমা পরেন। প্রচুর পান খান বলে দাঁতে কালো কালো দাগ আছে। তার কানে যেমন লম্বা লম্বা লোম আছে, নাকেও আছে। চুল কাটার সময় নাপিত নাকের গর্তে কেঁচি ঢুকিয়ে নাকের চুল কেটে দেয়। নাপিত এই কাজটা আমাদের বাসায় এসে করে বলে আমি দেখেছি। কুৎসিত দৃশ্য।

ভুল ইংরেজি অবলীলায় বলা বাবার স্বভাব। ট্রাক ব্যবসায় তিনি Loss খেয়েছেন এর ইংরেজি তিনি করলেন Big lost in truck business.

রাগারাজি, হৈ চৈ করা তার স্বভাব। তার ড্রাইভারদের তিনি বস্তি টাইপ গালাগালি করেন আবার কিছুক্ষণ পরেই, বাবা রে! কেন এরকম করিস বলে পিঠে হাত দেন।

সুতা কৃমি

সনজু

বয়স ১৮-১৯ কিংবা ষোল-সতেরো। রোগা। লম্বায় খুব সম্ভব পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা। চেহারা বালক বালক। মুখ লম্বাটে। চোখ মেয়েদের মতো। অর্থাৎ চোখের পাপড়ি বড় বড়। নাক সামান্য চাপা। ডান দিকের কপালে লাল তিল আছে। মাথার চুল কোঁকরানো, প্রায় নিগ্রো টাইপ। ঠোঁটও নিগ্রোদের মতো মোটা। তবে দেখতে খারাপ লাগে না।

এখন সুতা কৃমির ঘটনাটা বলি। সেদিন ছিল বুধবার। বুধবার সকালে আমার কোনো ক্লাস নেই। প্রথম ক্লাস এগারোটায়। ক্লাস নেবেন রবীন্দ্রবিশারদ ড. সিদ্দিক। রবীন্দ্রবিশারদরা সাধারণত নজরুলবিদ্বেষী হয়। তিনি নজরুলবিদ্বেষী। তার ধারণা কবি নজরুল একজন মহান পদ্যকার ছাড়া কিছুই না।

সিদ্দিক স্যার কখনও রোল কল করেন না, সবাইকে পার্সেন্টেজ দিয়ে দেন। কাজেই আমি ঠিক করলাম কলেজে যাব দুপুরের পর। টিভি দেখার জন্যে টিভি ছেড়েছি (বাবা বাসায় নেই তো, টিভি ছাড়া যায়)। জিটিভিতে শাহরুখ খানের কি একটা ছবি দেখাচ্ছে। শাহরুখ খানের অভিনয় আমার ভালো লাগে না। তার চেহারা ফাজিলের মতো, অভিনয়ও ফাজিলের মতো। তারপরেও দেখছি। হঠাৎ সুতা কৃমির বোন হাউমাউ করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই বলল, তরু আমার ভাইটাকে বাঁচাও, ওকে মেরে ফেলছে। ওর দুলাভাই ওকে মেরে ফেলছে। আমি ছুটে গেলাম।

গিয়ে দেখি রক্তারক্তি কাণ্ড। বেচারা লুঙ্গি পরেছিল। লুঙ্গি খুলে গেছে। সে মেঝেতে নেংটা হয়ে পড়ে আছে। ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। হাত কেটে রক্ত পড়ছে। সুতা কৃমির বোন নীলা ভাবী লুঙ্গি দিয়ে ভাইকে ঢাকল। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললাম, কী করছেন আপনি! এখন এ যদি মারা যায় আপনার তো ফাসি হয়ে যাবে। আমি সাক্ষী দেব।

ভদ্রলোক বললেন, তরু তুমি জানো না এ কত বড় চোর। আমার বিশ হাজার টাকা চুরি করেছে। নিজের হাতে ব্রাউন পেপারে মুড়ে ড্রয়ারে রেখেছি। আমরা তিন জন ছাড়া ঘরে আর কেউ আসে না ...

আমি বললাম, কথাবার্তা পরে শুনব। এখন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

আমার কথা শেষ হবার আগেই সুতা কৃমি রক্ত-বমি করা শুরু করল। এই দেখে সম্ভবত তার দুলাভাইয়ের টনক নড়ল। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে সুতা কৃমিকে নিয়ে রওনা হলো হাসপাতালের দিকে।

দুপুরে ভাত খাচ্ছি, নীলা ভাবী এসে জানাল ডাক্তাররা তার ভাইকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। আর টাকাটা চুরি হয় নাই। পাওয়া গেছে।

আমি বললাম, কোথায় পাওয়া গেছে?

নীলা ভাবী চোখ মুছতে মুছতে বলল, খাটের নিচে। ড্রয়ার থেকে নিচে পড়েছে, পায়ের ধাক্কা লেগে চলে গেছে খাটের নিচে।

জামান ভাই এখন কি বলছেন?

কী আর বলবে। কিছু বলছে না। গম্ভীর হয়ে আছে।

সরি তো বলবে।

আশ্চর্য কথা বললে। তোমার ভাই কি সরি বলার মানুষ। টাকা পাওয়া। গেছে এতেই সে খুশি।

সুতা কৃমি তিনদিন পর হাসপাতাল থেকে ফিরে স্বাভাবিকভাবে বাজার সদাই করা শুরু করল। কলেজে যাওয়া শুরু করল, যেন কিছুই হয় নি। আজ এই পর্যন্ত লিখলাম। কারণ আঠারোটা মোমবাতির এগারোটা শেষ হয়ে নিভে গেছে। বাকি সাতটাও যাই যাই করছে। কাজেই প্রিয় পাঠক সমাজ বিদায়।

তরুর লেখা এইটুকুই। আসল ঘটনা সে লেখায় বাদ দিয়েছে। উপন্যাসের শেষের দিকে আসলটা লিখবে। পাঠকদের জন্যে সাসপেন্স জমা থাকুক। একটা ছোট্ট সমস্যা অবিশ্য থাকবে—পাঠকরা বিশ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ভুলে যেতে পারে। সবার স্মৃতিশক্তি তো আলবার্ট আইনস্টাইনের মতো না যে, যা পড়বে সবই মনে থাকবে।

মূল ঘটনা হচ্ছে সুতা কৃমি বিশ হাজার টাকা ঠিকই চুরি করেছিল। এক দুপুর বেলায় তরুদের বাসায় ঘন ঘন কলিং বেল টিপছে। তার মুখে ঘাম। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। মুখ কাঁদো কাঁদো।

তরু বলল, কী সমস্যা?

সে ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট বের করে বলল, এই প্যাকেটটা রাখবেন?

তরু বলল, প্যাকেটে কি বোমা, না-কি পিস্তল?

টাকা। একশ টাকার দুটা বান্ডেল।

টাকা রাখব কেন? কার টাকা?

দুলাভাইয়ের।

তোমার দুলাভাইয়ের টাকা থাকবে তোমার কাছে কিংবা তোমার বোনের কাছে। আমার কাছে কেন?

সনজুর চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তরু লক্ষ করল তার হাত কাঁপছে। যে কোনো মুহূর্তে টাকার বান্ডেল হাত থেকে পড়ে যাবে।

তরু বলল, টাকাটা কি তুমি চুরি করেছ?

সনজু অন্য দিকে তাকিয়ে হাসূচক মাথা নাড়ল।

তরু বলল, ঝেড়ে কাশতে হবে। খুকখুক করে কাশলে হবে না। ঘটনা কী বলো?

আমি পালিয়ে যাব।

কোথায়?

টেকনাফে আমার এক বন্ধু আছে। কাঠ চিড়াই কলে কাজ করে। তার কাছে যাব।

বন্ধুর নাম কী?

এনামুল করিম।

পড়াশোনা বাদ দিয়ে কাঠ চেড়াই?

দুলাভাইয়ের কাছে থাকতে পারছি না। তিন মাসের কলেজের বেতন বাকি পড়েছে। কলেজে নাম কাটা গেছে। এই বিশ হাজার টাকা নিয়ে আমি পালিয়ে যাব।

তরু প্যাকেট রেখে দরজা বন্ধ করে দিল। মারামারির মূল ঘটনার পর জামান এবং তার স্ত্রী যখন সনজুকে নিয়ে হাসপাতালে তখন তরু টাকার প্যাকেট খাটের নিচে রেখে এসেছে।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর কয়েক বারই তরুর সাথে সনজুর দেখা হয়েছে। সনজু টাকার প্রসঙ্গ তুলে নি। তরুও না।

গতকাল তরু সনজুকে একটা সিএনজি ডেকে দিতে বলল। সনজু সিএনজি ডেকে দিল। তরু বলল, লক্ষ করলাম কলেজে যাচ্ছ।

সনজু বলল, হুঁ।

নাম যে কাটা গিয়েছিল, নাম কি উঠেছে?

উঠেছে।

তোমার দুলাভাই বেতনের টাকা দিয়েছেন?

আপা দিয়েছেন।

উনি কোত্থেকে দেবেন? উনার কি আলাদা টাকা আছে?

না। মনে হয় দুলাভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে দিয়েছেন।

তোমার বন্ধু এনামুল করিম কেমন আছে?

জানি না।

যোগাযোগ নাই?

না।

তার কি কোনো মোবাইল টেলিফোন আছে?

আছে।

নাম্বার জানা আছে?

আছে। আমার মোবাইলটা নিয়ে তার কাছে টেলিফোন করতে পারো।

দরকার নাই।

তরু হালকা গলায় বলল, তোমার দুলাভাইকে খুন করার কোনো পরিকল্পনা যদি করো, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমার এক বান্ধবী আছে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে পড়ে। ওর নাম নীলা। ওকে বললেই সে পটাশিয়াম সায়ানাইড জোগাড় করে দিবে। তুমি তোমার দুলাভাইয়ের খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। পারবে না?

না।

তারপরও আমি জোগাড় করে রাখব। সব ব্যবস্থা করা থাকবে। আমাকে বললেই হবে। ঠিক আছে?

সনজু তাকিয়ে রইল। তার সামান্য ভয় করতে লাগল। এই অদ্ভুত মেয়েটা এসব কি বলছে? ঠাট্টা করছে? না-কি সিরিয়াস? ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সিরিয়াস। সনজুর কপাল ঘেমে উঠল।

# ৩. ঢাকা শহরে বৃষ্টি

ঢাকা শহরে বৃষ্টি। ওসমান ছাদে। এক হাতে মাথায় ছাতি ধরে আছেন। ঝুমঝুম বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির সঙ্গে এলোমেলো বাতাস। তাঁর ভালো লাগছে। গরম এক মগ কফি যদি কেউ তার হাতে ধরিয়ে দিত আরো ভালো লাগত। কয়েক দিন আগে একটা ছবিতে এ রকম দৃশ্য দেখেছেন। পাহাড়ের চূড়ায় এক যুবক বসে আছে। তুষারপাত হচ্ছে। যুবকের হাতে মস্ত বড় এক কফি মগ কফির ধুয়া উঠছে। যুবক কফিতে চুমুক দিচ্ছে। এক ধরনের বিষণ্ণ আনন্দ নিয়ে তুষারপাত দেখছে। কফির কাপে চুমুক দেবার আগে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কাপের দিকে তাকাচ্ছে। যেন কাপের ভিতর সে কিছু দেখতে পাচ্ছে। পরিচালক ভালো মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। কফির কাপের ভেতরটার জন্যে দর্শকদের আগ্রহ তৈরি করেছেন।

তাঁর হাতে চায়ের কাপ থাকলে তিনিও এই কাজটা করতেন। কিছুক্ষণ তাকাতেন মগের ভেতরে। কিছুক্ষণ আকাশে। নিজেকে পর্বতারোহী ভেবে অন্যের জীবনযাপন করতেন। এটা এক ধরনের খেলা। পঙ্গু মানুষকে জীবনযাপন করতে হলে কিছু খেলা খেলতে হয়। যেমন—অভিনয় অভিনয় খেলা। ছবি আঁকাআঁকি খেলা। আকাশের তারা দেখা খেলা। নিজেকে সান্তুনা দেয়া–আমার জীবন হুইল চেয়ারে আইকা গাম দিয়ে কেউ আটকে দেয় নি। আমি পর্বতে উঠতে পারি। তুষারপাত দেখতে পারি। জলরঙ দিয়ে গহিন বনের ছবি এঁকে সেই বনে ঢুকে যেতে পারি।

চাচা কী করছেন?

তরু ছাদে এসেছে। মাথায় ছাতা-টাতা কিছু নেই। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওসমান বললেন, বৃষ্টিতে ভিজছি।

তরু বলল, আপনি ছাতার নিচে বসে আছেন। আপনি মোটেই বৃষ্টিতে ভিজছেন না। বৃষ্টিতে আমি ভিজছি। এখন বলুন কেন? আমি মোটেই বৃষ্টি

প্রেমিক না। তাহলে আমি কেন ভিজছি?

তুমি এসো করো স্নান নামে একটা উপন্যাস লিখছ এই জন্যেও বৃষ্টিতে ভিজছ।

হয়েছে। তবে উপন্যাসের নাম এখনো ফাইনাল হয় নি। যে পাঁচ পৃষ্ঠা আপনাকে দিয়েছি, পড়েছেন?

হ্যাঁ।

কেমন হয়েছে?

কেমন হয়েছে বলা আমার পক্ষে মুশকিল। একজন ঔপন্যাসিক সেটা বলতে পারবেন। যিনি তোমাকে উপন্যাস লেখার কলাকৌশল শিখিয়েছেন তাকে পড়তে দাও।

অসম্ভব। ঐ বাড়িতে যাওয়াই যাবে না।

কেন?

ঔপন্যাসিকের স্ত্রী অত্যন্ত সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মহিলা। আমি যতক্ষণ ছিলাম তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একসময় বলেই ফেললেন, তুমি হুট হুট করে আসবে না। উনি লেখালেখি করেন। ব্যস্ত থাকেন। সামনেই বইমেলা। আমি বললাম, আমি কি টেলিফোনে কথা বলতে পারি? ভদ্রমহিলা প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, কখনও টেলিফোন করবে না। ও কখনও টেলিফোন ধরে না। কেউ টেলিফোনে কথা বলতে চাইলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। এরপরেও কি ঐ বাড়িতে আমার যাওয়া উচিত?

না।

একজন পাঠক হিসাবে বলুন কেমন লেগেছে?

লেখায় গল্পের ভঙ্গিটা ভালো। তবে এই হচ্ছে আমার টেলিফোন নাম্বার, লেখা ভালো লাগলে যোগাযোগ করবেন অংশ ভালো লাগে নি।

কেন?

এই অংশে ছেলেমানুষি আছে তাই।

ছেলেমানুষি করার জন্যেই তো আমি ঐ অংশটা রেখেছি। ঐ টেলিফোন নাম্বার মোটেই আমার নাম্বার না। বানানো নাম্বার। আনা ফ্রাংকের ডায়েরি থেকে আপনি যদি ছেলেমানুষি অংশটা ফেলে দেন তাহলে ডায়েরি পড়তে ভালো লাগবে না।

তুমি আনা ফ্রাংকের ডায়েরি পড়েছ?

হুঁ। টিউটরিয়েল স্যার পড়তে দিয়েছিলেন। উনার নিক নেম চর্যা স্যার। চর্যাপদ পড়ান বলেই এই নাম। আনা ফ্রাংক পড়ে শেষ করে চর্যা স্যারকে ফিরত দিতে গিয়েছি। স্যার বললেন, রেখে দাও, ফেরত দিতে হবে না।

ভালো মানুষ মনে হচ্ছে।

হুঁ ভালো মানুষ—-আমার দিকে প্রেম প্রেম ভাব আছে বলে মনে হয়। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব।

আমার সঙ্গে পরিচয় করিতে দেবে কেন?

মানুষের সঙ্গেই তো মানুষ পরিচয় করে। উনার সঙ্গে গল্প করলে আপনার ভালো লাগবে। উনি সুন্দর করে কথা বলেন। কথা বললে দারুণ আনন্দ পাবেন।

ওসমান বললেন, আপাতত এক কাপ চা খেতে পারলে দারুণ আনন্দ পাব। তুমি চা বানিয়ে দিতে পারবে?

না। এখন পারব না। বৃষ্টিতে ভেজা শেষ হলে আমি ঘরে চলে যাব। কাজের মেয়েকে দিয়ে চা পাঠাব। দশ মিনিট পরে চা খেলে আপনার তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। না-ক্ষতি হবে?

ক্ষতি হবে না। আচ্ছা আমার লেখা পড়ে সুতা কৃমির প্রতি কি মমতা তৈরি হয়েছে?

না। কাপুরুষতা মমতা তৈরি করে না। শেক্সপিয়রের ঐ লাইনটা কখনও পড়েছ? Coward dies many times before their death.

না, পড়ি নি। সুন্দর লাইন তো। বাংলায় কী হবে? ভীতুরা মৃত্যুর আগেই অনেক বার মারা যায়। চাচা বাংলাটা ইংরেজির মতো সুন্দর লাগছে না কেন?

ওসমান ডান হাত থেকে বাঁ হাতে ছাতা বদল করতে করতে বললেন, ভীতু শব্দটার জন্যে। Coward শব্দের বাংলা ভীতু হবে না। যে মাকড়সা ভয় পায় সেও ভীতু। কিন্তু Coward শব্দ তার জন্যে না।

চাচা আপনার কি ধারণা আপনি খুব জ্ঞানী?

তা না। প্রচুর পড়ি তো, এই কারণেই হঠাৎ হঠাৎ দু-একটা জ্ঞানের কথা বলে ফেলি।

আর বলবেন না। আপনি জ্ঞানের কথা বললে আমার অসহ্য লাগে।

আচ্ছা আর বলব না। তোমার মনে হয় ঠাণ্ডা লেগে গেছে। শীতে কাঁপছ।

আমি চাচ্ছি আরো ঠাণ্ডা লাগুক। জ্বর আসুক। জ্বর নিয়ে লেপের ভেতর শুয়ে থাকতে আমার খুবই ভালো লাগে।

তাহলে আরও ভেজ।

বেশিক্ষণ ভিজতে পারব না। দেখুন আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। বৃষ্টির তেজও কমে গেছে। আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। দশ মিনিটের মাথায় আপনার চা চলে আসবে।

তরু শীতে কাঁপতে কাঁপতে নিচে নেমে গেল। মনে হয় বৃষ্টিটা তরুর জন্যেই এসেছিল। সে চলে যাওয়া মাত্র বৃষ্টি পুরাপুরি থেমে গেল। ওসমান অনেকক্ষণ চায়ের জন্যে অপেক্ষা করলেন। কেউ চা নিয়ে এলো না। তিনি নিজেই কফি বানিয়ে খেলেন। বৃষ্টির কারণে রুটিন খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেল। রুটিন মতো এখন ছবি আঁকার কথা। ছবি আঁকতে ইচ্ছা করছে না। লেপ গায়ে দিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি করতে ইচ্ছা করছে। তরুর কথা মাথায় ঢুকে গেছে। একে বলে Sympathetic reaction. তরু চাচ্ছিল তার জ্বর আসুক, সে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকবে। তিনিও তাই চাচ্ছেন। তরুকে নিয়ে তার কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে কি-না কে জানে।

সন্ধ্যা নাগাদ সত্যি সত্যি তার জ্বর এসে গেল। শরীর কাঁপিয়ে জ্বর। ওসমান নিজেকে বিছানায় তুললেন। হুইল চেয়ার থেকে বিছানায় ওঠার প্রক্রিয়া কষ্টকর। অনেক সময় লাগে। পায়ের কাছে রাখা কম্বলে শরীর ঢাকলেন। কম্বলে শীত মানছে না। লেপ হলে ভালো হতো। লেপ ট্রাংকে রাখা। ঘরে থার্মোমিটার আছে। রান্নাঘরে মেডিসিন ক্যাবিনেটে। থার্মোমিটার আনতে হলে আবার বিছানা থেকে হুইল চেয়ারে উঠতে হয়। কী দরকার? সন্ধ্যাবেলা মনিকা আসবে। সে-ই থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখবে।

মনিকা এসেছে। জ্বর মেপেছে। তাঁর জ্বর ১০৪.৫° কিংবা তার চেয়ে সামান্য বেশি। মনিকা গম্ভীর মুখে তার গা স্পঞ্জ করে দিচ্ছে। মেডিসিন ক্যাবিনেটে প্যারাসিটামল ছিল, প্যারাসিটামল খাইয়েছে। দোকান থেকে অরেঞ্জ জুস কিনে এনে গ্লাসে ঢেলে রেখেছে।

মনিকা বলল, স্যার, সকালে নাশতা ছাড়া আপনি আর কিছু খেয়েছেন?

ওসমান বললেন, না।

খালি পেটে কমলার রস খাওয়া যাবে না, এসিডিটি হবে। আপনার ঘরে বিসকিট নাই, বিসর্কিট নিয়ে আসি।

বিসকিট তোমাকে আনতে যেতে হবে না। রফিক খাবার নিয়ে আসবে। তাকে দিয়ে আনলেই হবে।

সে কখন খাবার আনে?

আটটার মধ্যে সব সময় আসে।

মনিকা বলল, আটটা দশ কিন্তু বাজে। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

ওসমান বললেন, ঝড়-বৃষ্টি-সাইক্লোন-টর্নেডো যাই হোক রফিক আসবে। কারণ, রফিক জানে সে যদি না আসে আমাকে উপোষ থাকতে হবে।

আপনার ঘরে কি মোমবাতি আছে?

আছে। ড্রয়ারে আছে। কেন?

ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে কারেন্ট চলে যাবে। আমি আগেভাগেই মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখতে চাই।

তুমি খুবই গোছানো মেয়ে।

আপনার মতো গোছানো না।

ওসমান বললেন, আমাকে গোছানো হতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। মনিকা শোনো, তুমি আমার creative writing-এর উপর কিছু বইপত্র জোগাড় করে দিতে পারবে।

কী করবেন? আমি ঠিক করেছি একটা উপন্যাস লিখব। একসঙ্গে কত কিছু করবেন?

কোনোটাই তো ক্লিক করছে না। তবে গল্প-উপন্যাস মনে হয় লিখতে পারব। আমি খুব গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারতাম।

পারতাম বলছেন কেন? এখন পারেন না?

অনেক দিন কাউকে চিঠি লিখি না, কাজেই বলতে পারছি না পারব কি-না।

কাউকে লিখে দেখুন।

ওসমান বললেন, চিঠি লেখার আমার তেমন কেউ নেই, তোমাকে লিখব?

মনিকা বলল, লিখতে পারেন।

কী লিখব?

মনিকা বলল, কী লিখবেন সেটা আপনি জানেন। আমি কীভাবে বলব। আপনার রফিক কিন্তু এখনও আসে নি।

ওসমান বললেন, চলে আসবে। তুমি বরং কমলার রসটা দাও। আমি খেয়ে নেই। কমলার রস না খাওয়া পর্যন্ত তোমার অস্থিরতা কমবে না। আমার এসিডিটির কোনো সমস্যা নেই। কাজেই অসুবিধা হবে না।

কমলার রস খাবার মাঝখানে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। ওসমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বাল্বের আলো চোখে লাগছিল, এখন আরাম লাগছে। মোমবাতির আলো চোখে আরাম দেয়।

মনিকা! কাগজ-কলম নিয়ে বসো তো। চিঠি লিখব। মুখে-মুখে বলে যাব তুমি লিখবে।

চিঠিটা কি আমাকেই লিখবেন?

হুঁ। লেখো হ্যালো মনিকা।

হ্যালো মনিকা কেন লিখব? আপনি তো আমাকে টেলিফোন করছেন না। চিঠি লিখছেন।

ইন্টারেস্টিং করার জন্যে হ্যালো মনিকা দিয়ে শুরু করেছি। তুমি লিখতে থাকো।

হ্যালো মনিকা।

তুমি এখন আমাকে কালার হুইল শেখাচ্ছ। ছবিতে রঙ বসাতে হবে কালার হুইল দেখে। যেন রঙে রঙে মিল থাকে। চোখে না লাগে। আমার কথা হচ্ছে প্রকৃতি কি রঙের ব্যাপারে কালার হুইল ব্যবহার করে? সূর্যাস্তগুলি আমি কিছুদিন হলো খুব মন দিয়ে দেখছি। সেখানে কালার হুইলের কোনো ব্যাপার নেই, হালকা ফিরোজা রঙের পাশেই গাঢ় খয়েরি।...

আপনি দ্রুত বলছেন, আমি এত দ্রুত লিখতে পারছি না।

সরি। তুমি কোন পর্যন্ত লিখেছ?

আমি অনেক পেছনে। আমি লিখেছি–সূর্যাস্তগুলি আমি কিছুদিন... তারপর কী, আমি ভুলে গেছি।

মনিকা জ্বরটা কি আরেকবার দেখবে? মনে হয় বেড়েছে।

মনিকা জ্বর মাপল ১০৪.৫°, ওসমান বললেন, থার্মোমিটার নষ্ট না তো? জ্বর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এটা অস্বাভাবিক না?

মনিকা বলল, থার্মোমিটার ঠিক আছে। স্যার আপনার রফিক এখনও আসে নি।

ওসমান বললেন, চলে আসবে। চলে আসবে।

জ্বরের ঘোরে চলে আসবে বাক্য মাথায় ঢুকে গেল। গ্রামোফোনের পিন আটকে যাবার মতো ক্রমাগত চলে আসবে চলে আসবে হচ্ছে।

মনিকা বলল, স্যার আমাকে চলে যেতে হবে। দশটার সময় হোস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে যায়।

ওসমান বললেন, চলে আসবে। রফিক চলে আসবে।

মনিকা বলল, আপনাকে একজন ডাক্তার দেখানো দরকার। এখন ডাক্তার কোথায় পাব।

ওসমান বললেন, ডাক্তার চলে আসবে।

মনিকা বলল, আপনার কোনো রিলেটিভকে টেলিফোন করলে আসবে না? আপনার পাশে কাউকে থাকা দরকার।

ওসমান বললেন, চলে আসবে। সবাই চলে আসবে।

মনিকা উঠে দাঁড়াল। দোতলার কাউকে পাওয়া গেলে খবর দেবে। তার নিজের ইচ্ছে করছে থেকে যেতে। অসুস্থ মানুষের জন্যে থেকে যাওয়া অন্যায় কিছু না। কিন্তু থাকা সম্ভব না।

ইলেকট্রিসিটি নেই, কাজেই কলিং বেল কাজ করছে না। অভ্যাসের কারণে মনিকা কলিং বেলের বোতাম চেপেই যাচ্ছে। কলিং বেল চাপাচাপির মধ্যেই কারেন্ট চলে এলো। দরজা খুলল তরু। সহজ-স্বাভাবিক গলায় বলল, ভেতরে আসুন।

মনিকা বলল, ভেতরে আসব না। আমার নাম মনিকা।

আপনাকে চিনি। আপনি চাচাকে ছবি আঁকা শেখান। আপনার সঙ্গে একদিন আমার কথাও হয়েছে।

ও হ্যাঁ, কথা হয়েছিল। আপনার নাম মিস্ট্রি।

ভেতরে এসে বসুন। দরজায় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা বলবেন।

আমি চলে যাব। আমাদের হোস্টেলের গেট দশটার সময় বন্ধ করে দেয়। একটা খবর দিতে এসেছিলাম—ওসমান স্যারের শরীর খুব খারাপ করেছে। প্রচণ্ড জ্বর, একশ চার।

তরু বলল, একশ চার পয়েন্ট পাঁচ হবার কথা।

মনিকা বিস্মিত হয়ে বলল, হ্যাঁ তাই।

তরু বলল, চাচার থার্মোমিটারটা নষ্ট। জ্বর যতই হোক এই থার্মোমিটারে উঠবে একশ চার পয়েন্ট ফাইভ। তারপরেও আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি লোক পাঠাচ্ছি। সনজু বলে একটা ছেলে আছে, সে প্রয়োজন হলে রাতে উনার সঙ্গে থাকবে।


সূচিপত্র

মনিকা বলল, থ্যাংক ইউ। আপনার কাছে কি ভালো থার্মোমিটার আছে? আসল জ্বরটা কত দেখতাম।

তরু থার্মোমিটার বের করে দিল। মনিকা উঠে গেল ছাদে।

ওসমান দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানায় বসে আছেন। রফিক এসেছে। টিফিন কেরিয়ারের বাটি সাজাচ্ছে।

ওসমান বললেন, তুমি এখনও যাও নি।

মনিকা বলল, আপনার জ্বর কি চলে গেছে?

ওসমান বললেন, পুরোপুরি যায় নি, তবে যাব যাব করছে।

আপনার থার্মোমিটার যে নষ্ট, সেটা তো বলেন নি।

থার্মোমিটার ঠিক আছে। তরুর ধারণা নষ্ট। কারণ আমার যখনই জ্বর ওঠে একশ চার পয়েন্ট পাঁচ ওঠে।

আশ্চর্য তো।

ওসমান বললেন, অনেক ছোটখাটো আশ্চর্য আমাদের চারদিকে ছড়ানো। আমার দূর সম্পর্কের এক খালার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। শুধু বুধবারে পড়ে। অন্য কোনো বারে না।

এক ধরনের মেডিকেল মিস্ত্রি ছাড়া আর কি! তুমি দেরি করো না, চলে যাও। রফিক চলে এসেছে। সে রাতে থাকবে।

মনিকা বলল, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন। দুটা থার্মোমিটার দিয়ে আমি আপনার জ্বর মাপ।

দিলাম পাঁচ মিনিট সময়।

দুটা থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপা হলো। দুটোতেই নিরানব্বই পাওয়া গেল।

মনিকা চলে গেছে। ওসমান রফিককে দুটা নতুন ইংরেজি শব্দ দিলেন–একটা হলো : Fever জ্বর, অন্যটা Pain ব্যথা।

রফিক বলো জ্বর ইংরেজি কী?

ফিভার।

ফিভারের সঙ্গে মিল আছে এমন একটা শব্দ পরশুদিন শিখিয়েছিলাম মনে আছে।

রিভার।

রিভার মানে কী?

নদী।

তাহলে ফিভার রিভার কী হবে?

জ্বর নদী।

ওসমান মুগ্ধ গলায় বললেন, কি সুন্দর বাক্য জ্বর নদী।

# ৪. তরু আজ আবার উপন্যাস নিয়ে বসেছে

তরু আজ আবার উপন্যাস নিয়ে বসেছে। তবে আজকের ম্রায়োজন অন্য রকম। মোমবাতি অফ, টেবিল ল্যাম্প জ্বালানো হয়েছে। ফাউন্টেন পেনের বদলে আজ বলপয়েন্ট। একটি লাল কালির বল পয়েন্ট অন্যটি নীল কালির। লাল কালিতে লেখা অংশ মূল উপন্যাসে থাকবে না। নীল কালিরটা থাকবে। লাল কালির লেখা উপন্যাসের ব্যাখ্যামূলক। বাড়তি আয়োজনের মধ্যে আছে বাটি ভর্তি পানি। সেখানে শুকনো বকুল ফুল ছাড়া হয়েছে। ফুলগুলি পানিতে ডুবছে না ভেসে আছে। হালকা গন্ধ ছড়াচ্ছে।

লেখালেখির জন্যে রাতটা ভাল। বৃষ্টি হচ্ছে। তরুদের গ্যারাজের ছাদ টিনের বলে বৃষ্টির শব্দ কানে আসছে। তার বাবা বাসায় নেই। মুনসিগঞ্জে গিয়েছেন। তাদের একটা ট্রাক রিকশার খাদে একসিডেন্ট করেছে। রিকশা যাত্রী মারা গেছে। থানাওয়ালারা ট্রাক আটক করেছে। তরুর বাবা ঝামেলা মিটাতে গিয়েছেন। তাঁর ফিরতে দেরি হবে। তিনি টেলিফোনে তরুকে রাতের খাবার খেয়ে নিতে বলেছেন। তরু ঠিক করেছে যত রাতই হোক বাবা বাড়ি ফিরলে খাবে। বৃষ্টিবাদলার রাত বলেই খাবারের বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। খিচুড়ি এবং ভুনা গরুর মাংস।

তরু বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে লিখছে।

লাল কালির লেখা
(মূল উপন্যাসে যাবে না)

সব উপন্যাসে একটা মূল প্লট থাকে। মূল প্লটকে ঘিরে ছোটখাটো নানান সব প্লট। আমি কোনো মূল প্লট খুঁজে পাচ্ছি না। যেহেতু উত্তম পুরুষে লিখছি—নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া অংশ নিয়ে লিখছি সে কারণেই গল্প খুঁজে পাচ্ছি না। বেশিরভাগ মেয়ের মতো আমার জীবনে তেমন কোনো গল্প নেই। খুবই সাধারণ অবস্থা। আমি বিশাল বড়লোকের মেয়ে হলে আমার জীবনে অনেক গল্প থাকত। বড়লোকের মেয়েদের অনেক গল্প থাকে। আজেবাজে ধরনের গল্প। পাঠকদের তেমন কোনো গল্প দিতে পারলে তারা মজা পেত।

আমার পরামর্শদাতা লেখক বলেছেন সব শিল্প মাধ্যমে বিনোদন একটি প্রধান অংশ। পিকাসো যে ছবি আঁকেন সেখানেও বিনোদন থাকতে হবে। এই লেখকের সঙ্গে আমি কথা বলি মোবাইল টেলিফোনে। মোবাইল টেলিফোনের নাম্বার তিনি আমাকে দিয়েছেন। এবং বলেছেন সকাল সাতটা থেকে এগারোটার মধ্যে কথা বলতে। আমি চিন্তা করে বের করেছি এই সময় লেখক-পত্নী তার মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যান। লেখক সাহেবের ভাবভঙ্গি আমার মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না। সেদিন আমাকে বললেন—তরু সাহিত্যের প্রতি তোমার আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করছে। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। সাহিত্যের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে যা টেলিফোনে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

আমি বললাম, স্যার বাসায় আসি?

না বাসায় না। অন্য কোথাও নিরিবিলিতে বসতে হবে। লেখালেখির চাপ যখন খুব বাড়ে তখন আমি একটা হোটেলের রুম ভাড়া করি। সেখানে আসতে পারো।

স্যার আপনার তো ডিসটার্ব হবে। অপিনি লেখালেখির জন্যে রুম ভাড়া করছেন সেখানে আমার সঙ্গে বকরবকর করা কি ঠিক হবে!

সমস্যা নেই। একনাগাড়ে লিখতেও তো ভালো লাগে না। সামনের মাসে পনেরো তারিখ থেকে রুম ভাড়া করব। তুমি টেলিফোন করে চলে এসো।

ম্যাডাম রাগ করবেন না তো।

রাগ করবে কেন? তুমি তো কাজে আসছ। অকাজে তো আসছ না।

তাও ঠিক।

টেলিফোনের কথাবার্তার এই পর্যায়ে আমি লেখক স্যারকে পুরোপুরি হকচকিয়ে দেবার জন্যে বললাম, স্যার আলাপ-আলোচনায় রাত যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কি রাতে হোটেলে থেকে যেতে পারি?

লেখক স্যার কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, এই বিষয়ে পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে। বলেই টেলিফোন রেখে দিলেন। তারপর থেকে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে লেখক সাহেবের টেলিফোন আসতে লাগল। আমি টেলিফোন ধরি না। বুঝতে পারছি ভদ্রলোক আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছেন। জরুরি কিছু। আমাকে না পেয়ে অস্থির বোধ করছেন।

অস্থিরতা তৈরি করাও একজন লেখকের কাজ। লেখক পাঠকের ভেতর অস্থিরতা তৈরি করবেন। আমি একজন লেখকের ভেতর অস্থিরতা তৈরি করছি এটাই কম কি?

লেখক সাহেব একদিন আমাকে বললেন, মেয়েদের মধ্যে বড় লেখক কেন হয় না জানো?

আমি বললাম, জানি না।

লেখক সাহেব বললেন, তাদের মধ্যে inbuilt কিছু সুচিন্তা কাজ করে। দৈহিক সম্পর্কের মতো অতি পবিত্র একটি বিষয় তারা এড়িয়ে যেতে চায়।

আমি বললাম, স্যার দৈহিক সম্পর্ক কি পবিত্রঃ।

তিনি বললেন, অবশ্যই। এই সম্পর্কের কারণে নতুন একটি প্রাণ সৃষ্টি হয়। যে কারণে একটি প্রাণের সৃষ্টি সেই কারণ অপবিত্র হবে কেন?

আমি বললাম, স্যার সবধরনের দৈহিক সম্পর্কই কি পবিত্র?

তিনি বললেন, আমি সে রকমই মনে করি।

এই কথাটা বলেই লেখক সাহেব কিন্তু ফেঁসে গেলেন। কিংবা বলা যায় তিনি আমার পাতা ফাঁদে পা দিলেন। কারণ আমি অত্যন্ত বিনীত গলায় বললাম, আচ্ছা স্যার মনে করুন আপনার স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে গর্ভবতী হয়ে গেলেন। নতুন একটি প্রাণ সৃষ্টি করলেন। এটা কি পবিত্র?

লেখক স্যার কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, তোমার মাথায় কিছু চিন্তাভাবনায় গিট্টু লেগে গেছে। গিট্টু ছুটাতে হবে।

গিট্টু কে ছুটাবে?

আপনি? চেষ্টা করে দেখব।

লেখক স্যার আমার গিট্টু ছুটানোর অপেক্ষায় আছেন। তিনি এখনো জানেন না আমি কঠিন চিজ। আমি তাঁর মাথায় এমন পিটু লাগিয়ে দেব যা তিনি কোনোদিন ছুটাতে পারবেন না। আমি তার প্রেমে পড়েছি এ রকম একটা লেখা খেলব। সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখব। গিফট কিনে পাঠাব। তারপর? তারপরেরটা তারপর।

হয়তো আমাকে খুব খারাপ মেয়ে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ আমি সামান্য খারাপ। প্রতিহিংসার ব্যাপারটা আমার মধ্যে আছে। লেখক সাহেব আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে হোটেলে নিতে যাচ্ছেন—এই ব্যাপারটা আমি নিতেই পারছি না। লেখকরা হবেন অনেক উপরের মানুষ। তাঁরা জাতির আত্মা। তারা কেন এমন হবেন?

আমার বাবা সাধারণ মানুষ। ব্যবসাপাতি নিয়ে থাকেন। একজন বিপত্নীক। তার মধ্যে তো এ রকম ছেকছুকানি নেই। একজন রূপবতী তরুণী কাজের মেয়ে কিছুদিন আমাদের বাসায় ছিল। প্রথম দিনেই বাবা তাকে বললেন, মাগো! আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দাও। কাজের মেয়েটা ধাক্কার মতো খেয়ে অনেকক্ষণ বাবার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার দৃষ্টি দেখেই বুঝেছি কোনো গৃহকর্তা এর আগে তাকে মা ডাকেনি। বরং আড়ালেআবডালে অন্য ইঙ্গিত করেছে।

এখন মূল উপন্যাস শুরু করছি।

নীল কালি লেখা

সুতা কৃমি আমার প্রেমে পড়েছে। কি ভাবে বুঝলাম? মেয়েদের তৃতীয় নয়ন থাকে। এই নয়নে সে প্রেমে পড়া বিষয়টা চট করে বুঝে ফেলে। পুরুষের খারাপ দৃষ্টিও বুঝে। মুরুব্বি কোনো মানুষ মা মা বলে পিঠে হাত বুলাচ্ছে সেই স্পর্শ থেকেও সে বুঝে ফেলে মা ডাকের অংশে ভেজাল কতটুকু আছে।

সুতা কৃমির প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা তৃতীয় নয়নের সাহায্য ছাড়াই কি ভাবে বুঝলাম সেটা বলি। আমার মোবাইলে একটা SMS পেলাম। রোমান হরফে বাংলায় লেখা—

Apnake na Dekila amar
Boro Kosto hoi.

মোটামুটি বাংলা হবে, আপনাকে না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়।

সে যদি লেখত, তোমাকে না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয় তাহলে কিছু রাখঢাক থাকত। আমার মনে হতো অন্য কেউ পাঠিয়েছে। সুতা কৃমি আমাকে আপনি করে বলে। SMS-এ সে এই কাজই করেছে।

আমি তাকে ডেকে পাঠালাম। সে আমার সামনে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। আমি বললাম, খবর কি?

সে বলল, ভালো।

আমি বললাম, তুমি কি আমার কাছে ফোনে এসএমএস পাঠিয়েছ?

সে বলল, না তো। আমার কোনো মোবাইল টেলিফোন নাই।

আমি বললাম, এসএমএস করার জন্যে মোবাইল ফোন থাকতে হয় না। কোনো মোবাইলের দোকানে পাঁচ টাকা দিলেই তারা এই কাজটা করতে দেয়।

সুতা কৃমি বিড়বিড় করে বলল; অল্লাহর কসম এই কাজটা আমি করি নাই।

আমি বললাম, মনে হচ্ছে আমার ভুল হয়েছে। তুমি যাও।

সে প্রায় ছুটে বের হয়ে গেল। যাবার সময় দরজায় বাড়ি খেয়ে মাথা ফুলিয়ে ফেলল। আমি ভালো মেয়ে হলে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যেত। যেহেতু আমি সামান্য খারাপ মেয়ে, আমি ব্যাপারটা এখানে শেষ হতে দিলাম না। পরদিন তাকে আবার ডেকে পাঠালাম। আমি বললাম, আমার ধারণা তুমি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ। ধারণাটা কি ঠিক?

সে জবাব দিল না। ভীত চোখে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, প্রেম আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটা যদি One sided হয় তাহলে তার গুরুত্ব আরো বেশি। তোমার গভীর প্রেমে সাড়া দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না, তবে তুমি ইচ্ছা করলে একবার আমাকে চুমু খেতে পারো। চাও?

সুতা কৃমি ঘামতে শুরু করল। আমি বললাম, এক মিনিটের জন্যে আমি চোখ বন্ধ করছি। চুমু খেতে চাইলে চুমু খেয়ে বিদায় হও। আমি চোখ বন্ধ করার আগেই সে দৌড়ে পালিয়ে গেল। এবারো সিড়ি ঘরের দরজার সাথে ধাক্কা খেয়ে মাথা ফাটাল।

এই পর্যন্ত লিখে তরু হাই তুলল। আজকের মতো লেখা শেষ। আর লিখতে ইচ্ছা করছে না। লেখার শেষ অংশটা বানানো। সুতা কৃমিকে সে চুমু খেতে বলেনি। অসম্ভব একটা বিষয়। উপন্যাসকে ইন্টারেস্টিং করার জন্যে লেখা। যা করেছে তা হলো—সে বলেছে। তুমি এক মিনিটের জন্যে আমার হাত ধরতে পারো। বলেই সে তার হাত বাড়িয়েছে। হাত বাড়াতে দেখে সুতা কৃমি দৌড়ে পালিয়েছে। দরজায় বাড়ি খেয়ে মাথা ফাটিয়েছে।

আপু খানা খাবেন না?

কাজের মেয়ে সফুরা কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে সে জানে না। সফুরা নিঃশব্দে হাঁটে। তারপরেও একজন পেছনে দাঁড়াবে সে টের পাবে না তা হয় না। একজন লেখকের পর্যবেক্ষণ শক্তি যেমন বেশি থাকবে তেমনি অনুভব শক্তিও বেশি থাকতে হবে।

খান লাগাব আপু?

তরু বলল, খানার আবার লাগালাগি কি? সুন্দর করে বলবে টেবিলে খাবার দিব?

সফুরা বলল, টেবিলে খাবার দিব?

রান্না কি?

কই মাছ।

আরো গুছিয়ে বললাকৈ মাছ কিভাবে রান্না হয়েছে?

মটরশুঁটি দিয়ে।

আরো গুছিয়ে বলো। ঝোল ঝোল করে রান্না, না-কি পাতলা করে?

সফুরা হেসে ফেলল। তরু বলল, হাসছ কেন?

সফুরা বলল, আপনার কথাবার্তা শুনলে মাঝে মধ্যে হাসি আসে।

আমার কথাবার্তা শুনে কখনোই তো তোমাকে হাসতে দেখি না। আজ প্রথম দেখলাম। সামনে থেকে যাও, টেবিলে খাবার দাও।

টেলিফোন বাজছে। মোবাইল টেলিফোনের অনেক মজার মজার ব্যাপার আছে। রিং টোনে নিজের পছন্দের মিউজিক ছাড়াও কথাবার্তাও ঢুকানো যায়। তরুর মোবাইল যখন বাজে তখন তরুর গলা শোনা যায়। এই তরু এই। সে নিজেই নিজেকে ডাকে। এই রিং টোন সে শুধু তার বাবার জন্যে রেখেছে। অন্যদের জন্যে সাধারণ রিং টোন। তরু টেলিফোন ধরে বলল, বাবা! বাসায় আসবে না?

দেরি হবে। ঝামেলায় আছি। তুই খেয়ে নে। আমার জন্যে জেগে থাকিস না।

আচ্ছা।

বড় বড় কৈ মাছ এনেছিলাম। ঠিকমত বেঁধেছে কি-না কে জানে। যত্ন করে যে মাছই কিনি ওরা নষ্ট করে ফেলে। ওসমান সাহেবকে দুইটা মাছ পাঠিয়ে দিস।

আচ্ছা।

নিজে নিয়ে যাবি। কাজের মেয়েকে দিয়ে পাঠাৰি না। এটা অভদ্রতা।

সনজুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেই?

ঠিক আছে। ভালো কথা মনে করেছিস সনজুকে একটা মাছ পাঠিয়ে দে। বাজার করার সময় সঙ্গে ছিল।

ওদের বাসায় মানুষ তিনজন, একটা মাছ পাঠাব কি ভাবে? ওকে বরং এখানে ডেকে খাইয়ে দেই।

বুদ্ধি খারাপ না। মা, টেলিফোন রাখি?

তরু বলল, বাবা শোনো, যত রাতই হোক আমি জেগে থাকব।

বললাম তো দরকার নাই।

তরু বলল, দরকার না থাকলেও জেগে থাকব।

বাবার সঙ্গে কথা শেষ করে সে সনজুকে খবর পাঠাল। রাতে খেতে বলল। দুটা কৈ মাছ ওসমান সাহেবকে দেয়ার কথা। তার নিজের নিয়ে খওয়ার কথা। সে সফুরাকে পাঠাল। সঙ্গে ছোট্ট চিঠি–

দুটা কৈ মাছ পাঠালাম। এরা স্বামী-স্ত্রী। অর্থাৎ একটি
পুরুষ মাছ একটি মেয়ে মাছ। ইতি তরু।

সনজু খেতে বসেছে। তাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। সে চোখ তুলে তাকাচ্ছেও না।

সনজু বলল, আমি কৈ মাছ খাই না।

তরু বলল, কেন খাও না?

কাটা বাছতে পারি না। এই জন্যে খাই না।

তরু বলল, আমি কাঁটা বেছে দেই?

সনজু ভীত গলায় বলল, না!

তরু বলল, তুমি বাচ্চা ছেলে না। আমার সামনে কাটা বাছবে এবং খাবে। গলায় কাঁটা লাগলে লাগবে।

আচ্ছা।

সনজু কৈ মাছের কাঁটা বাছছে, তরু তাকিয়ে আছে। তরু লক্ষ করল সনজুর হাত সামান্য কাঁপছে। তরু বলল, তুমি আমার বাবার কৈ মাছ খাওয়া দেখেছ?

না।

দেখার মতো দৃশ্য। বাবা পুরো মাছটা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে মাথা ধরে টান দেন। পুরো কাঁটাটা চলে আসে। কাঁটাগুলি তিনি ফেলে দেন না। মাথাসুদ্ধ সব কাঁটা মুখে দিয়ে চিবাতে থাকেন। আমাদের বাসায় কোনো বিড়াল থাকলে এই দৃশ্য দেখে হার্টফেল করত।

সনজু বলল, কেন?

তরু বলল, বিড়ালদের হার্ট খুব দুর্বল থাকে। কাউকে কাঁটা খেতে দেখলে তারা হার্টফেল করে।

এটা জানতাম না। নতুন জিনিস জানলাম।

তরু বলল, বোকার অভিনয় আমার সামনে না করলে ভালো হয়। তুমি ঠিকই বুঝেছ আমি কেন বলেছি, বিড়াল হার্টফেল করত। বুঝনি?

বুঝেছি।

বোকা সাজলে কেন?

দুলাভাইয়ের সামনে সবসময় বোকা সেজে থাকতে থাকতে এ রকম হয়েছে।

বোকা সাজায় লাভ কিছু হচ্ছে?

হচ্ছে।

কি লাভ হচ্ছে?

এখন দুলাভাই আমাকে হিসাবে ধরেন না। আমার সামনেই গোপন টেলিফোনগুলি করেন। তিনি ধরেই নিয়েছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

গোপন টেলিফোন মানে কি?

একটা মেয়েকে তিনি প্রায়ই হোটেলে নিয়ে যান। মেয়েটার নাম নীলু।

তোমার আপা কিছু জানেন না?

না।

তুমি তোমার আপাকে কিছু জানাবে না?

না। আমিই ব্যবস্থা নিব।

কি ব্যবস্থা নিবে ঠিক করেছ?

হ্যাঁ।

আমাকে বলবে?

না।

যা করার একা একাই করবে?

একা করব না। আমার কিছু আজেবাজে বন্ধু-বান্ধব আছে। তারা সাহায্য করবে।

আজেবাজে মানে কি? কি ধরনের আজেবাজে?

খুবই খারাপ ধরনের। ভিডিওর দোকানে কাজ করে। ফেনসিডিল খায়।

তুমি ওদের সঙ্গে জুটলে কি ভাবে?

সনজু জবাব দিল না। সে একমনে খাচ্ছে। তরু বলল, কৈ মাছ খেতে কেমন লাগছে?

ভালো।

তোমাদের বাসায় আজ কি রান্না হয়েছে?

রান্না হয় নি।

কেন?

দুলাভাই আপাকে মারধোর করেছে। এইজন্যে রান্না হয় নি। আমি দুলাভাইয়ের জন্যে তেহেরি কিনে এনেছি। দুলাভাই তাই খেয়েছেন।

তোমার আপা কিছু খান নি?

ভাই খেয়হয় নি। আমি

না।

আপাকে ফেলে একা আরাম করে খাচ্ছ খারাপ লাগছে না?

না।

তোমার দুলাভাইকে শিক্ষা দেবার পরিকল্পনায় আমার সাহায্য লাগলে বলবে।

সাহায্য লাগবে না। খবিসটাকে আমি নেংটা করে রাস্তায় হাঁটাব।

এইটাই শাস্তি?

আরো আছে।

আর কি?

সেটা আপনাকে বলা যাবে না। যখন হবে তখন দেখবেন।

উনি যদি টের পান শাস্তি প্রক্রিয়ায় তুমি যুক্ত তাহলে কি হবে ভেবে দেখেছ?

দুলাভাই টের পাবে না। তার ধারণা আমি মহাগাধা।

তুমি মহাগাধা না?

এক সময় ছিলাম। এখন না।

ফেনসিডিল খেয়ে বুদ্ধি খুলেছে?

আমি ফেনসিডিল খাই আপনাকে কে বলল?

তোমার বন্ধুরা যখন খায় তখন তুমিও খাও।

মাঝে মধ্যে খাই।

আজ খেয়েছ?

হুঁ। সন্ধ্যাবেলা খেয়েছি।

কতটুকু খেয়েছ?

বেশি ছিল না। তিন বোতল চারজন ভাগ করে খেয়েছি।

আমার জন্যে এক বোতল নিয়ে এসো খেয়ে দেখব।

সনজু খাওয়া বন্ধ করে চোখ তুলে তাকাল। তরু বলল, ছেলেরা নেশা করলে মেয়েরাও করতে পারে। পারে না?

না।

না কেন? তোমরা দুনিয়ার হুজ্জত করবে আর চাইবে বাড়ির মেয়ের মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকবে। তসবি টানবে। তা কি ঠিক? অবশ্যই আমাকে এক বোতল ফেনসিডিল এনে দেবে।

আচ্ছা।

তোমার দুলাভাইকে নেংটা করে রাস্তায় কবে হাঁটাবে? আমাকে আগেই জানিও।

সনজু কিছু বলল না। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ-মুখ কঠিন। তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে কিছু বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না।

# ৫. তরু বসে আছে

সকাল দশটা।

তরু বসে আছে। ওসমান তরুর উপন্যাস পড়ছেন। মন দিয়ে পড়ছেন বলেই মনে হচ্ছে। তিনি বসে আছেন হুইল চেয়ারে। তরু বসেছে তাঁর পাশেই বেতের চেয়ারে। সে ক্রমাগত পা দুলাচ্ছে। মাঝে মাঝে পা লেগে যাচ্ছে হুইল চেয়ারে। ওসমান তাকাচ্ছেন তরুর দিকে। তরু সরু গলায় বলছে— সরি। কিছুক্ষণ পর শুরু কাজটা আবার করছে। এতে মনে হতে পারে হুইল চেয়ারে পা লাগানোর কাজটা শুরু ইচ্ছা করেই করছে।

জানালা গলে রোদ এসে ঢুকেছে ঘরে। বাতাসে খোলা পর্দা কাঁপছে বলে রোদের পাশের ছায়া কাঁপছে। তরুর দৃষ্টি রোদের দিকে। তার কাছে মনে হচ্ছে ছায়া স্থির হয়ে আছে। রোদ কাপছে। ট্রেনে কোথাও যাবার সময় তার এরকম মনে হয়। পাশাপাশি দুটা ট্রেন। তাদেরটা থেমে আছে। পাশেরটা চলতে শুরু করেছে। তরুর মনে হয় তাদেরটাই চলছে। পাশেরটা স্থির।

ওসমান বললেন, তরু উপন্যাস যতটুকু লিখেছে পড়েছি। মিথ্যা অংশগুলি ভালো হয় নি।

তরু অবাক হয়ে বলল, কোন অংশগুলি মিথ্যা?

ওসমান বললেন, এই যেমন তুমি বললে এক মিনিট সময় দিলাম, চুমু খেতে চাইলে খেতে পারো।

কি করে বুঝলেন মিথ্যা? সত্যিও তো হতে পারে।

তুমি যখন মিথ্যা কথা লিখো তখন হাতের লেখা বদলে যায়। তুমি নিজেই দেখো।

তরু বলল, তাই তো দেখছি। ঠিক আছে মিথ্যা লিখেছি ভালো করেছি। লেখকরা যা লেখেন সবই সত্যি?

ওসমান বললেন, যারা সত্যিকার লেখক তাদের মাথায় একটা কনভার্টার থাকে। মিথ্যাগুলি তারা কনভার্টারে ঢুকান, সেখানে তারা সত্যি হয়ে বের হয়ে আসে। সত্যিকার লেখকদের কোনো কথাই মিথ্যা না। ভুয়া লেখকদের সত্যিটাও মিথ্যা।

তরু পা নাচানো বন্ধ করল। রোদের খেলাটাও সে এখন আর দেখছে। ওসমান বললেন, কথা শুনে মেজাজ খারাপ হচ্ছে?

হুঁ।

ওসমান বললেন, মেজাজ খারাপ যখন হচ্ছেই তখন আরেকটু মেজাজ খারাপ করে দেই?

তরু বলল, দিন।

তোমার লেখায় কোনো প্লট নেই। লেখা পড়ে মনে হয় মাঝি নেই এমন একটা নৌকায় বসে আছ, বাতাস নৌকাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে যাচ্ছ। যখন বাতাস থাকছে না তখন তুমিও স্থির হয়ে বসে আছি। তোমার লেখার নৌকায় মাঝি লাগবে। পাল লাগবে। প্রয়োজনে গুণটানার ব্যবস্থাও করতে হবে।

আপনি একটা প্লট দিন। সেই প্লটে লিখব।

ওসমান বললেন, আমি নিজেই তোমার উপন্যাসের একটা প্লট হতে পারি। একজন পঙ্গু মানুষ। ছাদের চিলেকোঠায় থাকে। হুইল চেয়ারে ঘুরে। চরিত্র হিসেবে ইন্টারেস্টিং। তার জীবনে প্রেম নিয়ে আসে। অল্প বয়েসি একটা মেয়ে তার প্রেমে পড়ুক।

তরু বলল, অল্প বয়েসি একটা মেয়ে পঙ্গু লোকের প্রেমে পড়বে কোন দুঃখে?

ওসমান বললেন, অল্পবয়েসি মেয়ের প্রেম যুক্তিনির্ভর না। আবেগনির্ভর। লোকটির Disability তার চোখে পড়বে না। তাঁর চোখে পড়বে লোকটির mental ability, লোকটির মানসিক সৌন্দর্য।

তরু বলল, আপনার ধারণা আপনার মানসিক সৌন্দর্য তাজমহল টাইপ?

তুমি তোমার লেখায় তাই করবে। আমার মানসিক সৌন্দর্য তাজমহল পর্যায়ে নিয়ে যাবে। এটাই তো লেখকের কাজ। লেখক কাদামাটি হাতে নিয়ে অপূর্ব মূর্তি তৈরি করেন।

তরু বলল, উপন্যাসের ক্ষেত্রে কি হবে? মেয়েটা পঙ্গুটাকে বিয়ে করবে? সুখে ঘর-সংসার করতে থাকবে? তাদের কিছু পঙ্গু ছেলেমেয়ে হবে? না-কি কোনো ছেলেমেয়েই হবে না?

ওসমান বললেন, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? তুমি আমার কাছে প্লট চেয়েছ আমি প্লট দিলাম। পছন্দ হলে এই নিয়ে লিখবে। পছন্দ না হলে লিখবে না।

তরু বলল, আপনি যে প্লট দিয়েছেন সেই প্লটের ইংরেজি নাম শিট প্লট। বাংলায় গু প্লট।

ওসমান শব্দ করে হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তরু বলল, আপনার হাসির শব্দ সুন্দর। বেশ সুন্দর। আমি একটা ক্যাসেট প্লেয়ারে আপনার হাসি ক্যাসেট করে রাখব।

ওসমান বললেন, ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে আসো। আজই ক্যাসেট করো।

তরু বলল, আজ না। চা খাবেন?

খেতে পারি।

তরু চা বানাতে গেল। হুইল চেয়ারে ওসমান তার পেছনে পেছনে গেলেন। তরু বলল, চায়ে চিনি দেব?

দাও।

তরু বলল, সনজুকে নায়ক বানিয়ে নতুন করে উপন্যাসটা লিখলে কেমন হয়?

ওসমান বললেন, তাও করতে পারো। সেও কিন্তু পঙ্গু, মানসিকভাবে পঙ্গু। এবং চরিত্র হিসেবে ইন্টারেস্টিং। আমার চেয়েও ইন্টারেস্টিং। আমি ছাদে বন্দি, সে নিজের কাছে বন্দি। তবে তুমি বারবার তার প্রসঙ্গে লিখছ সুতাকৃমি এটা অরুচিকর। সাহিত্যে রুচির একটা ব্যাপার আছে।

তরু বলল, আপনি কি এখানেই চা খাবেন? না-কি আমরা ছাদে যাব?

চলো ছাদে যাই। রোদে চিড়বিড় করতে করতে চা খাওয়ারও আনন্দ আছে। চা নিয়ে একটা চায়নিজ প্রবচন আছে। শুনবে?

শুনতে ইচ্ছা করছে না। তারপরেও বলুন—

যে খায় চা, তার সর্ব রোগ না।

তরু কিছু বলল না। সে নিঃশব্দে চা খেয়ে যাচ্ছে। সে যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে সনজুকে দেখা যাচ্ছে। সনজু রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে চাপাভাঙা এক যুবক। মাথায় চুল নেই, ফেট্টি বাঁধা। সে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে এবং একটু পরপর থু থু ফেলছে। একনাগাড়ে সেই যুবকই কথা বলছে। সনজু শুনে যাচ্ছে। এমন কোনো অস্বাভাবিক দৃশ্য না কিন্তু তরুর সামান্য অস্থির লাগছে। যুবকের বাঁ হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকানো। সে একবারও হাত বের করছে না। প্যান্টের পকেটে কি পিস্তল না ফেনসিডিলের বোতল? ছেলেটা মনে হচ্ছে বাঁ হাতি। ডান হাতি ছেলে হলে ডান হাতটা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের জন্য পকেটে ঢুকিয়ে রাখত।

কি দেখছ তরু?

তরু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল, কিছু দেখছি না। আচ্ছা আপনার কাছে মনিকা নামের যে মেয়েটা আসত সে আর আসে না কেন?

মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে। তার স্বামীর পছন্দ না সে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছবি আঁকা শেখায়।

আপনার ছবি আঁকা তাহলে বন্ধ।

হুঁ। একে একে আমার সবই বন্ধ হবে। তবে আমি হতাশ না। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে একটা দরজা বন্ধ হলে আরেকটা দরজা খুলে।

আপনার কোন দরজাটা খুলেছে?

এখনো বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারলে তোমাকে বলব।

তরু বলল, একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখলে কেমন হয়—শার্লক হোমস টাইপ। বাড়িতে খুন হবে। ডিটেকটিভ সূত্র ধরে ধরে খুনিকে বের করে ফেলবেন।

মহিলা ডিটেকটিভ?

ঠিক ধরেছেন, মহিলা ডিটেকটিভ।

খুনটা তোমাদের বাড়িতে হবে?

হ্যাঁ। এমন একজন খুন করবে যে সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

সে কে?

তরু বলল, মনে করুন আমিই খুন করলাম আবার আমিই সূত্র ধরে ধরে অপরাধী খুঁজে বের করলাম।

ওসমান বললেন, সূত্র ধরে ধরে তোমাকে অপরাধী খুঁজে বের করতে হবে কেন? তুমি তো জানোই কে অপরাধী। তোমার সূত্র খোজাটা হাস্যকর হবে না।

হু হবে।

ওসমান চায়ের কাপ নামিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, এক কাজ করো, তোমার বাবাকে Criminal বানাও। তিনি তার দুই স্ত্রীকে খুন করেছেন। কেউ কোনোদিন তা ধরতে পারে নি। তার মেয়ে সূত্র খুঁজে খুঁজে...

তরু ওসমানের কথা শেষ হবার আগেই কঠিন গলায় বলল, আপনি একজন Sick person. একজন সিক পার্সনের মাথাতেই এ ধরনের গল্প আসে। শারীরিকভাবে যারা পঙ্গু তারা মানসিকভাবেও পঙ্গু থাকে।

ওসমান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তরু তার আগেই ছাদ থেকে নেমে গেল। সিঁড়ির গোড়ায় তরুর বাবা আব্দুল খালেক দাঁড়িয়ে আছেন। তার হাতে কানকোয় দড়ি দিয়ে বাঁধা তিন ফুট সাইজের একটা জীবন্ত বোয়াল। মাছটা বারবার লেজ এদিক-ওদিক করছে।

খালেক হাসি মুখে বললেন, এত বড় বোয়াল আগে দেখেছিস? Seen before?

তরু বলল, না।

এর সারা শরীর ভর্তি চর্বি। বিলের মাছ। Fish of the বিল।

বিলের মাছ কি করে বুঝলে?

কালো রঙ। বিলের মাছ কালো হয়। নদীর মাছ হয় সাদা। এই মাছ আজ তুই রাঁধবি। You are cooking.

তরু বলল, বাবা ভুলভাল ইংরেজি বলবে না। শুনতে খুবই খারাপ লাগে। বিলের মাছ আমি রাঁধব না। মাছটা নষ্ট হবে। আমি রাঁধতে পারি না।

কোনো চিন্তা করবি না। আমি ডিরেকশন দেব।

তুমি রাঁধতে জানো?

অবশ্যই জানি। দিনের পর দিন বেঁধেছি। তুই রান্নার জন্যে মেন্টাল প্রিপারেশন নিয়ে নে। আমি মাছ কাটিয়ে আনছি।

খালেক মহাব্যস্ত ভঙ্গিতে বের হয়ে গেলেন। তরু সঙ্গে সঙ্গে ছাদে উঠে গেল। ওসমান ঠিক আগের জায়গাতেই আছেন। চোখ বন্ধ করে গায়ে রোদ মাখাচ্ছেন। তরুর পায়ের শব্দে চোখ মেললেন। তরু বলল, আপনি তো সর্ববিদ্যা বিশারদ। মাছ রাঁধতে পারেন?

কি মাছ?

বোয়াল মাছ।

সাইজ কি?

বিশাল সাইজ।

ওসমান বললেন, বোয়াল মাছের প্রধান সমস্যা তার আঁশটে গন্ধ অন্য মাছের চেয়ে বোয়াল মাছের আঁশটে গন্ধ বেশি। এই গন্ধ দূর করার জন্যে প্রথমেই সামান্য লবণ এবং লেবু দিয়ে মাছটাকে কচলে আঁশটে গন্ধ বের করে ফেলবে। কয়েকবার গরম পানিতে ধুবে।

তারপর?

যেহেতু মাছের সাইজ অনেক বড়, মাংসের মশলা কিছু লাগবে।

তরু বলল, পুরো রেসিপি বলুন। আজ আমি বোয়াল মাছ রাধব।

পাতিলে তেল দিবে। তেল যখন গরম হবে তখন পেঁয়াজ বাটা দেবে। পেঁয়াজ বাটা ভাজা ভাজা হবার পর সামান্য হলুদ, শুকনা মরিচ দেবে। খুব সামান্য জিরা বাটা দিতে পারো। বড় মাছ বলেই জিরা বাটা। সামান্য আদা বাটা। চায়ের চামচে এক চামচ মেথি দিলে সুন্দর ফ্লেবার হবে। মশলা কষানো হলে পানি দেব। এরপর মাছ দেবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছ সেদ্ধ হয়ে যাবে, তখন ধনে পাতা দিয়ে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে।

লবণ লাগবে না?

অবশ্যই লাগবে তবে বোয়াল মাছ কিছুটা লবণাক্ত। লবণ কম দিতে হবে। এই রান্নাতে যদি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ফ্লেবার দিতে চাও তাহলে চায়ের চামচে আধা চামচ চিনি

দিতে পারো। ঠাকুরবাড়ির মহিলারা ঝাল খাবারে চিনি মেশানো শুরু করেছিলেন। অনেকেই তাদের অনুসরণ করে। আমার মতে চিনি না মেশানোই ভালো। তবে আমি একটা বিশেষ ইনগ্রেডিয়েন্ট দিতে বলব। যদি দাও অসাধারণ জিনিস হবে।

কি ইনগ্রেডিয়েন্ট?

মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট। চায়নিজ খাবারে স্বাদ বর্ধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টেস্টিং সল্ট বলে।

তরু বলল, আপনি রান্না শিখলেন কোথায়?

ওসমান বললেন, বই পড়ে। যারা বেড়াতে যেতে পারে না তারা ভ্রমণের বই পড়ে। যারা রাঁধতে পারে না তারা রান্নার বই পড়ে।

তরু বলল, ভাত ঝরঝরা করার উপায় কি? আমি রান্না করলেই একটার গায়ে একটা ভাত লেগে যায়।

ওসমান বললেন, প্রতিটি চাল একটা একটা করে আলাদা সিদ্ধ করবে। তারপর একত্র করে পরিবেশন করবে।

ঠাট্টা করলেন?

হ্যাঁ।

আগের রেসিপিটা কি ঠাট্টা না রিয়েল?

আগেরটা রিয়েল। আমি সাধারণত ঠাট্টা করি না। পঙ্গুরা ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপারে খুব সাবধান।

তরুর বাবা আগ্রহ করে বোয়াল মাছ খেলেন এবং বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই এত ভালো রান্না কার কাছে শিখেছিস? আমি আমার লাইফে এত ভালো বোয়াল মাছের ঝোল খাই নাই।

তরু বলল, বাবা বেশি বেশি হচ্ছে না?

খালেক বললেন, বেশি বেশি হচ্ছে না। কম কম হচ্ছে। তোকে গোল্ড মেডেল দেয়া দরকার। রান্নায় স্বর্ণপদক।

মেডেলে কি বোয়াল মাছের ছবি আঁকা থাকবে?

ঠাট্টা না আমি সিরিয়াস। সত্যি আমি তোকে একটা গোল্ড মেডেল দেব। তুই কি মাংস রান্না করতে পারিস? খাসির মাংস রান্না করতে পারবি?

চেষ্টা করে দেখতে পারি। আচ্ছা বাবা, মায়ের রান্নার হাত কেমন ছিল?

খালেক বললেন, সে যা রাঁধত সবই অখাদ্য। সেই অখাদ্য রান্না নিয়ে কিছু বললে মুখ ভোঁতা করে রাখত।

তরু বলল, তোমার কি তখন ইচ্ছা করত মুখে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলি!

খালেক খাওয়া বন্ধ করে বললেন, এটা কেমন কথা?

তরু বলল, কথার কথা বললাম।

খালেক বললেন, এটা কি ধরনের কথার কথা? তোর সমস্যাটা কি?

কোনো সমস্যা নেই।

সমস্যা অবশ্যই আছে। সমস্যা ছাড়া কেউ এ ধরনের কথা বলে না।

সরি বাবা।

সবসময় সৃরিতে কাজ হয় না। এমন একটা ভয়ংকর কথা তোর মাথায় এলো কিভাবে?

তরু বলল, বাবা আমি একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখছি। সেখানে এক ভদ্রলোক তার প্রথম স্ত্রীকে খুন করে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তারপর দ্বিতীয় স্ত্রীকেও খুন করেন। সারাক্ষণ উপন্যাসের প্লট নিয়ে ভাবি তো এই জন্যেই মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।

খালেক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোর ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখার দরকার কি? লেখালেখি হচ্ছে মাথার পোকা, খবরদার মাথায় পোকা ঢুকাবি না।

আচ্ছি।

একটা কথা বলে খাওয়ার আনন্দটাই নষ্ট করে ফেলেছিস।

সরি বাবা।

খালেক প্লেট রেখে উঠে পড়লেন। দ্বিতীয় মাছের পেটিটা তিনি মাত্র নিয়েছেন। এখনো মুখে দেন নি। এতে তরুর খুব যে মন খারাপ হলো তাও না। সে নিজে মাছ খেল না। তার গা দিয়ে বোয়াল মাছের বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে। সে এক ঘন্টা সময় নিয়ে গরম পানি দিয়ে গোসল করল, তাতেও গা থেকে বোটকা গন্ধ দূর হলো না। দুপুরে সে কিছুই খেল না। দুপুরে তার ঘুমানোর অভ্যাস নেই। তবে ছুটির দিনে সে কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি করে। তার মোবাইলে সুডোকু নামে অংকের একটা খেলা আছে। এই খেলাটা খেলে। সুডোকুতে সে ভালোই এক্সপার্ট হয়েছে। জাপানের টোকিওতে প্রতি বছর সুডোকু উৎসব হয়। তার ধারণা বাংলাদেশ থেকে কেউ তাকে সুডোকু উৎসবে পাঠালে সে প্রাইজ নিয়ে ফিরত।

তরু সুডোকু খেলতে খেলতেই ঘুমিয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে ওসমান সাহেব খোলা দরজা দিয়ে তার ঘরে ঢুকেছেন। হেঁটে হেঁটে ঢুকেছেন। তরু বলল, আপনার অসুখ সেরে গেছে?

তিনি বললেন, হুঁ।

বোয়াল মাছ রান্না করে পাঠিয়েছিলাম। খেয়েছেন?

হুঁ।

খেতে কেমন হয়েছে বললেন না তো!

তোমাকে অতি জরুরি একটা কথা বলতে এসেছি। হাতে সময় নেই।

স্বপ্নের এই পর্যায়ে দেখা গেল তিনি চক-ডাস্টার হাতে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়ানো। গম্ভীর গলায় বক্তৃতা দিচ্ছেন।

স্ট্যাটিসটিক্স বলছে দশ দশমিক দশ ভাগ স্ত্রী স্বামীর হাতে খুন হয়। তিন রকম খুন আছে। ক শ্রেণীর খুন, খ শ্রেণীর খুন এবং গ শ্রেণীর খুন।

ক শ্রেণীর খুন অনিচ্ছাকৃত। স্বামীর ধাক্কা খেয়ে স্ত্রী উল্টে পড়ে মাথায় ব্যাথা পেলেন। সেখান থেকে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যু।

খ শ্রেণী খুন Impulse-এর বশবর্তী হয়ে খুন। হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে স্বামী এই কাজটি করেন। রাগ কমে যাবার পর তার দুঃখের সীমা থাকে না। তখন সে নিজেও আত্মহত্যা করতে চায়।

গ শ্রেণীর খুন। এরা ঠাণ্ডামাথায় একের পর এক খুন করে। এদের বলা হয় Serial Killer, যেমন তোমার বাবা খালেক সাহেব।

তরু বলল, স্যার (স্বপ্নে মনে হচ্ছিল ওসমান সাহেব তার শিক্ষক। কিছুক্ষণের জন্যে লেকচার বন্ধ রাখবেন। আমার একটা কল এসেছে জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে। সুডোকু কম্পিটিশনে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ।

তরুর ঘুম ভাঙল মোবাইল ফোনের শব্দে। সে টেলিফোন ধরে বলল,?

আমি সনজু।

কি চাও?

আমার বুবুকে দুলাভাই ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। সে কলতলায় বসে আছে। তাকে একটু ঘরে নিয়ে যান।

তুমি বলো আমাদের ঘরে আসতে।

সনজু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বুবুর গায়ে কোনো কাপড় নাই। বুবুকে উনি নেংটো করে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন।

কি বলছ এসব?

সত্যি কথা বলছি। একটা চাদর নিয়ে কলতলায় যান।

তরু চাদর নিয়ে কলতলায় গিয়ে দেখে সনজুর বোন সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। থরথর করে কাঁপছে। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে

গভীর লজ্জাবোধের বাইরেও কিছু আছে যা চট করে ব্যাখ্যা করা যায় না। তরু চাদর দিয়ে মহিলাকে ঢেকে দিল।

তরু বলল, আপনি ঘরে আসুন।

মহিলা তাকালেন। তরুর কথা বুঝতে পারলেন বলে মনে হলো না। সনজুকে দেখা যাচ্ছে। সে কলতলার দক্ষিণে পেয়ারা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে। সে তাকিয়ে আছে গেটের দিকে। কলতলায় কি ঘটছে তা সে জানে না, এরকম একটা ভঙ্গি।

তরু আবার বলল, আসুন।

ভদ্রমহিলা নড়ে উঠলেন। কিন্তু আগের মতোই জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলেন। সনজু পেয়ারা গাছের নিচ থেকে বলল, বুবু যাও। উনার সঙ্গে যাও।

বেশিরভাগ দিন খালেক বাসায় খেতে আসেন না। দুপুর বেলাটা ব্যবসাবাণিজ্যের জন্যে কঠিন সময়। জটিল সমস্যার সমাধান হয় দুপুরে মানুষ যখন ক্ষুধার্ত থাকে তখন। ঝামেলা মিটিয়ে মানুষ তখন খেতে বসতে চায়। ক্ষুধার্ত মানুষ ঝামেলা নিতে পারে না। খালেক নিয়ম করে রেখেছেন বড় ধরনের ঝামেলা ছাড়া তিনি দুপুরে বাসায় থাকবেন না। আজ বাসায় এসেছেন। কারণ জ্বরে তার শরীর পুড়ে যাচ্ছে।

জ্বর উঠেছে কাঠের দোকানে। একশ সিএফটি সেগুন কাঠ কিনতে গিয়েছেন। দরদাম ঠিক করছেন। হঠাৎ তার মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল। তিনি ধপ করে বসে পড়লেন। কাঠের দোকানের মালিক আনিস বলল, কি হয়েছে?

মাথাটা হঠাৎ চক্কর দিয়ে উঠল।

পানি খাবেন। একটু পানি খান।

খালেক পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে পানি নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, পানি তিতা লাগছে।

আনিস বলল, বাসায় যান। বাসায় গিয়ে শুয়ে থাকেন। সঙ্গে কি গাড়ি আছে?

জি না।

গাড়ি দিচ্ছি। আপনাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসবে। কাঠ আরেকদিন কিনবেন।

খালেক বললেন, কাঠ আজই কিনব। আমি কাজ ফেলে রাখি না।

আনিস বলল, ক্যাশিয়ারের কাছে টাকা জমা দিন। আপনার একশ সিএফটি কাঠ আমি আমার দায়িত্বে জায়গামতে পৌছায়ে দিব। আপনি অসুস্থ মানুষ, আপনি আমার উপর ভরসা করেন।

খালেক বললেন, ভরসা করলাম। আনিস নামের যুবকটাকে তার পছন্দ হয়েছে। চেহারায় কাঠিন্য আছে। কথাবার্তায় নেই। সব ব্যবসায়ীর মধ্যেই কাস্টমারের সামনে হাত কচলানো স্বভাব আপনাতেই চলে আসে। এর মধ্যে নেই।

আনিস বলল, আপনি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন আমি ডাক্তার খবর দিয়েছি। আপনার প্রেসারটা দেখবে।

খালেক বলল, কোনো দরকার নাই।

আনিস বলল, দরকার আছে কি নাই সেটা ডাক্তার বুঝবে। আপনার কি ডায়াবেটিসের কোনো সমস্যা আছে?

কখনো মাপি নাই।

একটা বয়সের পরে শরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাঝে মধ্যে করা উচিত। আমার বাবার ছিল হাই ডায়াবেটিস, হাই প্রেসার। কোনোদিন পরীক্ষা করান নাই। একদিন আমি জোর করে পরীক্ষা করালাম। সব অসুখ-বিসুখ একসঙ্গে ধরা পড়ল। ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু। আমি ব্যবসা করা টাইপ ছেলে না। বাবার ব্যবসা হঠাৎ এসে মাথার মধ্যে পড়েছে।

আগে কি করতেন?

পাস করার পর কিছুই করতাম না। অভিনয়ের সখ ছিল। যারা প্যাকেজ নাটক করে এদের পিছে পিছে অনেক ঘুরেছি। খুবই ফালতু ধরনের কয়েকটা ক্যারেক্টারে অভিনয়ও করেছি। এখন সব বাদ।

বিয়ে করেছেন।

জি না।

খালেকের হঠাৎ মনে হলো তরুর পাশে এই ছেলেটাকে খুবই মানায়। দুজনের চেহারায় কোথায় যেন একটা মিলও আছে।

ডাক্তার চলে এসেছে। প্রেসার নরমাল পাওয়া গেল। সুগারও মাপা হলো। র্যানডমে ৬.২ এসব কিছু না। আনিসের গাড়িতে করে তিনি বাসায় ফিরলেন। বত্রিশ ভাগা ব্যবসায়ীর লক্কর গাড়ি না। কালো রঙের ঝকঝকে গাড়ি। গাড়ির ভেতর বেলি ফুলের গন্ধ। খালেক ভেবেছিলেন এয়ার ফ্রেশনার দেয়া। পরে লক্ষ করলেন পেছনের সিটে বেতের ছোট্ট ঝুড়ি ভর্তি বেলী ফুল।

খালেক বাসায় ফিরলেন জ্বর নিয়ে। তার চোখ লাল। শরীর কাপছে। দৃষ্টি সামান্য উদ্ভ্রান্ত। তরু বলল, বাবা কি হয়েছে?

খালেক বললেন, সব ঠিক আছে। ডাক্তার চেক করেছে।

তরু বলল, শরীর পুড়ে যাচ্ছে। ডাক্তার কি চেক করেছে বুঝলাম না।

তুই ইউনিভার্সিটিতে যাস নাই?

না। বাসায় একটা ঝামেলা হয়েছে এই জন্যে যেতে পারিনি।

কি ঝামেলা?

কি ঝামেলা পরে শুনবে। এখন বিছানায় এসো। গা স্পঞ্জ করে দিব। তুমি তো ঠিকমতো হাঁটতেও পারছ না। আমার ঘাড়ে হাত রাখো।

খালেক বললেন, দরজা-জানালা বন্ধ করে দে। চোখে আলো লাগছে।

তরু বাবার মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে। সিলিং ফ্যান হালকা করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। জানালা বন্ধ। খোলা দরজা দিয়ে সামান্য আলো আসছে। খালেক তার মাথার কাছে বসা মেয়েকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন এবং এই প্রথম মনে হলো এমন রূপবতী মেয়ে তিনি তার জীবনে দ্বিতীয়টা দেখেন নি।

খালেক বললেন, তোর জন্যে আজ একটা ছেলে দেখলাম।

ভালো করেছ।

আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।

তরু জলপট্টি বদলাতে বদলাতে বলল, বিয়ের কথা পাকা করে চলে এসেছ নাকি বাবা?

না তোর পছন্দটা তো জানি না। তোর কি রকম ছেলে পছন্দ?

শায়লা ভাবীর হাসবেন্ডের মতো ছেলে আমার পছন্দ।

শায়লা ভাবী কে?

আমাদের ভাড়াটে। সনজুর বুবু।

খালেক অবাক হয়ে বললেন, সনজুর দুলাভাইয়ের মতো ছেলে তোর পছন্দ?

হুঁ।

কেন? সে তো শুনেছি তার স্ত্রীর সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করে।

এই জন্যেই তো তাকে আমার পছন্দ। আমার হাসবেন্ড আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে আর আমি তাকে শায়েস্তা করব। এতেই আমার আনন্দ।

তোর কথাবার্তার কোনো মা-বাপ নাই।

সনজুর দুলাভাই কি করেছে জানো। আজ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এমন এক নোংরা কারণে তালাক দিয়েছে যে শুনলে তোমার ইচ্ছা করবে লোকটাকে খুন করতে।

কি কারণ?

কি কারণ তোমাকে বলতে পারব না। তোমাকে কেন কাউকেই বলতে পারব না। বাবা শোনো, ঐ মহিলার কোথাও যাবার জায়গা নেই। তার এক ফুপু আছেন সেখানেও তিনি যেতে চাচ্ছেন না। উনি আছেন আমাদের এখানে। গেস্টরুমটা উনাকে ছেড়ে দিয়েছি।

খালেক বিরক্ত গলায় বললেন, কি বলিস তুই, আমার এখানে কেন থাকবে?

যাবে কোথায়?

যাবে কোথায় সেটা তো আমার দেখার কথা না।

তরু বলল, বাবা! তোমার জ্বর আরো বাড়ছে। এই সময় কথাবার্তা বন্ধ রাখো। জ্বর থামুক। তারপর যদি মহিলাকে এ বাড়িতে রাখতে না চাও ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেবে। আমি কিছুই বলব না। এখন ঘুমুতে চেষ্টা করো। চোখ বন্ধ করো।

খালেক সাহেব চোখ বন্ধ করলেন। প্রবল জ্বরের ঘোরে তিনি বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। একটি স্বপ্নে তিনি কাঠের একটা বাক্সে শুয়ে আছেন। তার গায়ে চায়ের পাতা ঢালা হচ্ছে। তিনি বলছেন, শুধু চায়ের পাতায় হবে না। বরফ দিতে হবে। তরু বলল, বরফ দিলে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে বাবা। কপুর দিচ্ছি। চা পাতা এবং কর দিলেই হয় আর কিছু লাগে না। এখন চোখ বন্ধ রাখো আমি বাক্সের ডালা বন্ধ করব।

হাতুড়ি-পেরেক এনেছিস?

হুঁ।

সাবধানে পেরেক পুতবি। হাতে যেন না লাগে।

আচ্ছা।

তরু বাক্সের ডালা বন্ধ করল। বাক্সটা এখন অন্ধকার। খালেক একটু পর পর পেরেক পোঁতার শব্দ শুনতে শুনতে গভীর ঘোরে চলে গেলেন। তাঁর ঘোর ভাঙল হাসপাতালে।

অপরিচিত একজন তরুণী তাঁর গায়ের চাদর ঠিকঠাক করে দিচ্ছে। খালেক বললেন, কে?

তরুণী জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল তরু। তরু বলল, বাবা একটু কি ভালো লাগছে?

খালেক বললেন, ঐ মেয়ে কে?

তরু বলল, সনজুর বোন।

সনজুটা কে?

জামান সাহেবের স্ত্রীর ছোট ভাই। শালা শব্দটা বলতে খারাপ লাগে বলে স্ত্রীর ছোট ভাই বললাম।

খালেক বললেন, জামান সাহেবটা কে?

তরু বলল, আমাদের এক তলার ভাড়াটে। বাবা এত কথা বলতে হবে। রেস্ট নাও। তোমার শরীর যে কতটা খারাপ তুমি জানো না। অজ্ঞান ছিলে চার ঘণ্টা।

খালেক বললেন, ঐ মহিলা এখানে কি করছে?

তরু বলল, সারাক্ষণ তোমার পাশে কাউকে থাকার কথা। আমি একা তো পারি না। উনি মাঝে মাঝে আমাকে সাহায্য করেন।

তার নাম কি?

শায়লা। বাবা প্রশ্ন শেষ হয়েছে? এখন চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করো। ক্ষিদে লেগেছে? কিছু খাবে? কমলার রস দেব?

না।

এক কাপ দুধ খাবে বাবা? কিংবা চিকেন স্যুপ। চামচে করে স্যুপ দেই? খেতে না পারলে খাবে না।

খালেক বললেন, আচ্ছা দে।

শুরু বড় চামচে করে স্যুপ খালেক সাহেবের মুখে ধরন্তে। তিনি খাচ্ছেন। খেতে ভালো লাগছে। টক-ঝাল স্যুপ। কোনোটাই বেশি না। টকও না ঝালও না। স্যুপ থেকে ধনিয়া পাতার গন্ধ আসছে। গন্ধটাও ভালো লাগছে।

স্যুপ কে বানিয়েছে, তুই?

শায়লা নামের মেয়েটা বানিয়েছে?

হুঁ। খেতে কি ভালো লাগছে বাবা?

লাগছে। তোর মা-ও ভালো সুপ বানাত। এই একটা জিনিসই সে ভালো পারত। এক গাদা ধনে পাতা দিত।

তরু ফট করে বলে ফেলল, বাবা এই মহিলাকে তুমি বিয়ে করে ফেললে তোমার সেবা-যত্ন খুব ভালো হবে। উনি খুব সেবা করতে পারেন।

খালেক মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর নিজের মেয়ে এ ধরনের কথা তার বাবাকে বলতে পারে তা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি। তাঁর উচিত এই মুহূর্তে মেয়ের গালে কষে চড় লাগানো। চড় না দিতে পারলেও কঠিন কঠিন কিছু কথা বলা দরকার। কথা বলার সুযোগ হলো না। শায়লা ঘরে ঢুকছে, সঙ্গে ডাক্তার। ডাক্তার ব্লাড প্রেসার দেখার জোগাড় করছে। খালেক অস্বস্তি নিয়ে শায়লার দিকে তাকালেন। মেয়েটা রূপবতী তবে নাক মোটা। তরুর মার নকিও মোটা ছিল। তার দ্বিতীয় স্ত্রী তরুর খালার নাকও ছিল মোটা। এই মেয়েটার নাকও মোটা। তার কপালে কি শুধুই মোটা নাকের মেয়ে?

খালেক চমকে উঠলেন। এই সব কি ভাবছেন? অসুখে ভুগে কি তাঁর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে! সুস্থ মাথার কেউ তো কখনো এরকম ভাববে না।

# ৬. তরুর লেখা ডায়েরি

তরুর লেখা ডায়েরি।

পঙ্গু চাচার (ওসমান সাহেব) পরামর্শ আমার পছন্দ হয়েছে। ঠিক করেছি ডিটেকটিভ উপন্যাসই লিখব। নির্ভেজাল একজন ভালো মানুষের হাতে খুন হয়েছে দুজন তরুণী। তারা দুই বোন। এই দুজনকেই ভদ্রলোক বিয়ে করেছিলেন। ছোট বোনের গর্ভে একটি মেয়ে জন্মায়। মেয়েটিকে ভদ্রলোক অত্যন্ত পছন্দ করেন। এই মেয়েটিই হত্যা রহস্যের সমাধান করে।

আমি কিছু খোঁজখবর নেয়া শুরু করি। বড় মামাকে টেলিফোন করি। তিনি থাকেন রাজশাহীতে। ফিসারিতে কাজ করেন। হঠাৎ আমার টেলিফোন পেয়ে তিনি খুবই অবাক।

তরু মা! কেমন আছ গো?

ভালো আছি মামা।

হঠাৎ টেলিফোন কেন গো মা?

একটা ইনফরমেশন জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা মামা আমার মা কিভাবে মারা গিয়েছিলেন?

তুই তো জানিস কিভাবে মারা গেছেন।

জানি। হার্টফেল করেছেন। বাবা ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার প্রাণপ্রিয় পত্নী চেগায়ে পড়ে আছে।

এইভাবে কথা বলছ কেন মা? তোমার সমস্যা কি?

কোনো সমসায় নেই। আচ্ছা মামা বড় খালা কিভাবে মারা গিয়েছিলেন?

এইসব কেন জিজ্ঞেস করছিস?

তিনিও তো হার্টফেল করে মারা গেছেন। ঠিক না? বাবা ঘুম থেকে উঠে দেখেন বড় খালা মরে চেগায়ে পড়ে আছেন।

তরু প্রোপার ল্যাংগুয়েজ প্লিজ।

মামা তোমাদের কি একবারও মনে হয় নি—এই দুজনের মৃত্যুই স্বাভাবিক না!

স্টপ ইট।

মামা এরকম কি হতে পারে যে বাবা এই দুই মহিলাকেই খুন করেছেন। তোমরা আমার কথা ভেবে চুপ ক্রে গেছ। পুলিশ বাবাকে ধরে নিয়ে গেলে আমার কি গতি হবে এটা ভেবে।

তরু! মাথা থেকে উদ্ভট চিন্তাভাবনা দূর করে।

আচ্ছা যাও দূর করলাম। এখন বলো তুমি কখনোই আমাদের বাসায় আস না। এর কারণ কি। নানিজনও আসেন না।

মা আসবে কিভাবে। মা মারা গেছে না?

যখন বেঁচেছিলেন তখনো তো আসেন নি। আমাকে দেখতে ইচ্ছা করলে গাড়ি পাঠাতেন। গাড়ি আমাকে নিয়ে যেত।

তরু কোনো কারণে তোমার কি মনটন খারাপ? আমার কাছে চলে আসো। কয়েক দিন থাকবে। তোমাকে নিয়ে পদ্মার পারে ঘুরব। পদ্মার চড়ে ক্যামপ ফায়ার করব। তোমার মামির সঙ্গে কথা বলবে?

মামির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না মামা।

আজেবাজে চিন্তা করবে না। খবর্দার না।

এই পর্যন্ত লেখার পর তরুকে উঠতে হলো। কারণ বাসায় আনিস নামের কে যেন এসেছে। কার্ড পাঠিয়েছে। কার্ডে লেখা–

আনিসুর রহমান
বি এ (অনার্স)
শৌখিন অভিনেতা।
টিভি, বেতার এবং চলচ্চিত্র

তরু ভেবেই পাচ্ছে না একজন শৌখিন অভিনেতা তার কাছে কি চায়। ভদ্রলোকের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্ন পর্যায়ের বলেই মনে হচ্ছে। শৌখিন অভিনেতার ভিজিটিং কার্ড ছাপায়ে এবং নামের শেষে বি এ অনার্স লিখবে কি জন্যে। বিএ অনার্স কি এমন কোনো বিদ্যা যে কার্ড ছাপিয়ে জাহির করতে হবে!

তরুকে দেখে আনিসুর রহমান বিএ অনার্স উঠে দাঁড়াল। তরু বলল, বাবার কাছে এসেছেন?

জি। শুনেছি উনার শরীর খারাপ। হাসপাতালে ছিলেন। দেখতে এসেছি।

তুরু বলল, খালি হাতে এসেছেন? হরলিক্সের কৌটা, ডাব, কমলা এইসব কিছু আনেন নি?

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, জি না।

তরু বলল, আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। কিছু মনে করবেন না।

আমি কিছু মনে করি নি। তবে খালি হাতে আশা অবশ্যই ঠিক হয় নি।

তরু বলল, বাবা ভালো আছেন। কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছেন। এখন আপনাকে আমি চিনতে পারছি। বাবা আপনার কাঠের দোকানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আপনি তার যথেষ্ট সেবাযত্ন করেছেন।

তেমন কিছু কিন্তু করি নি।

তরু বলল, বাবা জ্বরের ঘোরে ছিলেন তো। আপনার সমস্যাটাই তার কাছে অনেক বড় মনে হয়েছে। বাবা বাসায় ফিরেই আমাকে বলেছেন—তোর জন্যে একটা ছেলে দেখে এসেছি।

আনিস পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। কি সহজভাবেই মেয়েটা এইসব কথা বলছে। কোনো দ্বিধা নেই—কোনো সংকোচ নেই।

তরু বলল, চা খাবেন।

আনিস বলল, খেতে পারি।

তরু বলল, খেতে পারি বলার অর্থ অনিচ্ছার সঙ্গে খেতে রাজি হচ্ছি। আপনি আগ্রহের সঙ্গে চা খেতে চাইলেই আপনাকে চা দেব।

আনিস বলল, আমি আগ্রহের সঙ্গেই চা খেতে চাচ্ছি।

তরু বলল, আপনি হয়তো ভেবেছেন চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করবেন। তা হচ্ছে না। আমি এক্ষুনি আপনার কাছ থেকে বিদায়। নিয়ে চলে যাব। কাজের মেয়ে আপনাকে চা দেবে। আপনি একা একা চা খাবেন। উঠে চলেও যেতে পারবেন না। নিজেকে মনে হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গাধা। আমি যাচ্ছি, আপনার চা এক্ষুনি চলে আসবে।

আনিসকে চা দেয়া হয়েছে। সে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। সত্যি সত্যি নিজেকে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গাধা ভাবছে। একটাই সান্ত্বনা মেয়েটা তাকে চমকে দিয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও এরকম একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলার আনন্দ তুচ্ছ করার মতো না।

তরু ছাদে এসেছে। ওসমান সাহেব হুইল চেয়ারে ছাদে ঘুরপাক করছেন। তিনি তরুকে দেখেই বললেন, হ্যালো মিসট্রি।

তরু বলল, হ্যালো।

কিছু বলতে এসেছ? না-কি এম্নি সৌজন্য সাক্ষাৎ।

তরু বলল, আমি ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখা শুরু করেছি।

ভেরি গুড।

ধার করা উপন্যাস।

ধার করা মানে?

আপনার প্লটটা নিয়ে লিখছি। এক ভদ্রলোকের হাতে দুই স্ত্রী খুন। তিনি তৃতীয় একজনকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখনই গল্পের শুরু।

ইস্টারেস্টিং প্লট।

তরু বলল, ইন্টারেস্টিং প্লটে আপনার ভূমিকাটা বুঝতে পারছি না।

ওসমান বললেন, আমার ভূমিকা মানে?

ডিটেকটিভ উপন্যাসে আপনিও একটা চরিত্র। আপনাকে কিভাবে ফিট করব বুঝতে পারছি না।

আমাকে ফিট করার দরকার কি?

এত বাড়িঘর থাকতে আপনি আমাদের এখানে থাকতে এলেন কেন? বাবার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি? বাবা অবশ্যই আপনার বন্ধু মানুষ না। বাবাকে কখনোই আপনার সঙ্গে গল্প করতে দেখি না। দুজনের যোগাযোগটা কিভাবে হলো।

তোমার উপন্যাসে এই সব তথ্য দরকার?

অবশ্যই দরকার।

ওসমান দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, খুঁজে বের করো। একজন ডিটেকটিভ এই কাজটাই করেন।

তরু বলল, আপনি কি আমার মা বা বড় খালাকে চিনতেন?

তোমার মাকে চিনতাম।

তরু বলল, আপনি কি আপনার স্ত্রীর টেলিফোন নাম্বার দেবেন। আমি তার সঙ্গে কথা বলব।

কি কথা বলবেঃ ঠিক আছে যে কথা বলতে ইচ্ছা করে বললো। টেলিফোন নাম্বার দিচ্ছি।

তরু বলল, আপনার অস্বস্তি বোধ করার কোনো কারণ নেই। আমি আপনার সামনেই কথা বলব।

কে?

আমার নাম তরু?

তরুটা কে?

ওসমান চাচা আমাদের বাড়ির ছাদে থাকেন। আমার বাবার নাম খালেক।

কি চাও তুমি?

অনেক দিন আপনি আসেন না। এই জন্যে টেলিফোন করেছি। আবীর কি ভালো আছে?

হ্যাঁ সে ভালো আছে। রাখি কেমন। এখন একটু ব্যস্ত। বাসায় গেস্ট।

ওসমান বলল, ডিটেকটিভ কর্মকাণ্ডে কিছু পেয়েছ। কোনো ক্লু?

তরু বলল, পেয়েছি।

কি পেয়েছ? একজন ডিটেকটিভ কারো সঙ্গে শেয়ার করেন না।

ওসমান বললেন, শায়লা মেয়েটা তোমাদের বাড়িতে কি স্থায়ী হয়ে গেছে?

তরু বলল, সে রকমই মনে হচ্ছে।

খালেক রাতে খেতে বসে বললেন, আনিস এসেছিল?

তরু বলল, হ্যাঁ।

ছেলে কেমন? ভালো।

খালেক বললেন, এ রকম একটা ছেলের সন্ধানেই আমি আছি। Good person. Very good person. আমি খোঁজ লাগায়েছি।

কি খোঁজ?

চব্বিশ ঘণ্টা আমার স্পাই তার পিছে ঘুরবে। কোথায় যায়, কি করে, কাদের সঙ্গে মিশে— সব খোঁজ আনবে। যদি দেখি সব ঠিক তাহলে বিসমিল্লাহ শুভ বিবাহ। তোর আপত্তি আছে?

না।

তোর নিজের পছন্দের কেউ থাকলেও হিসাবে ধরব। আছে কেউ?

আছে।

খালেক ভুরু কুঁচকে বললেন, কে সে। কি করে?

টিচার।

তোদের পড়ায়?

হুঁ। চর্যা স্যার। আমাদের চর্যাপদ পড়ায়। বিবাহিত। চার ছেলেমেয়ে। বড় মেয়েটার বিয়ে হয়েছে।

খালেক মেয়ের দিকে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে থাকলেন। মেয়ের ঠাট্টাতামাশা করার বাজে স্বভাব হয়েছে। বাবার সঙ্গেও ঠাট্টা-তামাশা।

তিনি খাবারে মন দিলেন।

তরু! কোপ্তা কে বেঁধেছে।

শায়লা ভাবী।

আমিও তাই ভেনেছিলাম, কাজের মেয়ের রান্না আর ঘরের মহিলার রান্না—-ডিফারেন্স আছে। গ্রেট ডিফারেন্স। মুখে দিলেই বুঝা যায়।

তরু বলল, ভালো রান্না বেশিদিন ক্ষেতে পারবে না বাবা। শায়লা ভাবী যে কোনোদিন চলে যাবে।

কোথায় যাবে?

তার স্বামী তাকে আয় তুতু করে ডাকবে। সে ছুটে চলে যাবে।

খালেক বললেন, এই মহিলা কোনোদিনই যাবে না। কিছু জিনিস বুঝা যায়। এই মহিলার শিকড় এই বাড়িতে বসে গেছে। ঐ দিন দেখলাম ফার্নিচার ঝাড় পোছ করছে। যেন নিজের বাড়ি।

তোমার জন্য তো ভালোই।

কি ভালো?

তরু বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। খালেক মেয়েকে কঠিন কিছু কথা বলতে গিয়েও বললেন না। যে মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে তীকে কঠিন কথা বলা যায় না।

# ৭. জামান বারান্দায় মোড়ার উপর

জামান বারান্দায় মোড়ার উপর শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসা। তার সামনে আরেকটা মোড়া। সেখানে টিফিন ক্যারিয়ারে সকালের নাশতা। ছোট লাল ফ্লাস্কে চা। সনজু ভীত ভঙ্গিতে একটু দূরে দাঁড়ানো। প্রতিবারই নাশতা নিয়ে তাকে দুলাভাইয়ের কঠিন কথা শুনতে হয়। আজ মনে হয় আরো বেশি শুনতে হবে। পরোটা, বুটের ডাল আর সবজি আনার কথা। সে এনেছে সবজি আর ডিমের ওমলেট। বুটের ডাল পায় নি।

জামান টিফিন ক্যারিয়ার খুলল। খাওয়া শুরু করল। বুটের ডাল নাই কেন এই নিয়ে হম্বিতম্বি শুরু করল না। মনে হয় বুটের ডালের কথা তার মনে নাই।

সনজু বলল, চা কাপে ঢেলে দিব দুলাভাই?

দাও। চিনি ছাড়া এনেছ তো?

জি।

চা কাপে ঢালতে গিয়ে সমস্যা হলো। কিছু চা মেঝেতে পড়ে গেল। সনজু নিশ্চিত দুলাভাই এখন গর্জে উঠে বলবেন, সামান্য কাজটাও ঠিকমতো করতে পারো না। সেরকম কিছু বলল না। বরং চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জামান তৃপ্তির শব্দ করল।

চা কোত্থেকে এনেছ? বিসমিল্লাহ হোটেল?

সনজু বলল, না। রাস্তার পাশে ছোট একটা দোকান আছে। চা ভালো বানায়।

এখন থেকে এই চা আনবে।

জি আচ্ছা।

তোমার বোনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়?

জি না। এটা মিথ্যা। সনজুর সঙ্গে তার বোনের প্রতিদিনই কথা হয়।)

জামান বলল, যদি কোনোদিন ঐ মাগীর সঙ্গে কথা বলতে দেখি তাহলে টান দিয়ে জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলব। এটা যেন মনে থাকে।

জি আচ্ছা।

আমার চোখের সামনে ঐ মেয়ে অন্য লোকের বাড়িতে উঠে গেল। বাজারের মেয়ের যতটুকু লজ্জা-শরম থাকে তার তো তাও নাই। ঠিক বলেছি কি-না বলো।

জি।

কি শাস্তি দেয়া যায় বলো। তুমিই বলো! তোমার স্ত্রী যদি এ রকম ঘটনা ঘটাত তুমি কি করতে?

জানি না দুলাভাই।

দুলাভাই দুলাভাই করবে না। আমি আর তোমার দুলাভাই না।

জি আচ্ছা।

বেশ্যা মেয়েটাকে এমন এক শাস্তি দিতে হবে যেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মনে থাকে। পাড়ার মাস্তান ছেলেগুলিকে দিয়ে রেপ করালে কেমন হয়? ছয়সাত জন মিলে রেপ করলে জন্মের শাস্তি হয়ে যাবে। ঠিক বলেছি?

সনজু জবাব দিল না। জামানের চায়ের কাপ শেষ হয়েছে। সনজু আবার কাপে চা ঢেলে দিল। ফ্লাস্কে তিন কাপ চা ধরে। জামান খায় দু কাপ। শেষ কাপটা সনজুর।

জামান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তুমি এক কাজ করো, মাগীটার কাছে যাও। তাকে বলো শেষ সুযোগ কানে ধরে আমার সামনে দশ বার উঠবোস করবে। চাটা দিয়ে আমার জুতার ময়লা খাবে। একবার চাটলেই হবে। আমি অতীত ভুলে যাব।

এখন বলব?

হ্যাঁ এখনই যাও। খালেক সাহেব হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন?

জি।

উনার সামনে বা উনার মেয়ের সামনে কিছু বলবে না। আড়ালে ডেকে নিয়ে বলবে। সময় বেঁধে দিবে। যদি ফিরে আসতে চায় তাহলে সকাল দশটার মধ্যে আসতে হবে। আর

একটা কথা বলবে, সেটা হলো—রাগের মাথায় তালাক কোনো তালাক না। সে যেন ভেবে না বসে যে তালাক হয়ে গেছে।

সনজু বের হয়ে গেল। জামান পুরোপুরি নিঃসন্দেহ শায়লা এক্ষুনি চলে আসবে। তার যাবার কোনো জায়গা নেই। খালেক সাহেব বাসা থেকে বের করে দিলে প্রথম কয়েক দিন থাকবে ফুটপাথে। তারপরে স্থান হবে চন্দ্রিমা উদ্যানে। নিজের ভাই হবে দালাল। কাস্টমার ধরে আনবে। দরদাম ঠিক করবে।

শায়লা বলল, এখন যেতে বলেছে?

সনজু বলল, সকাল দশটার মধ্যে যেতে বলেছে। তুমি যাবে?

হুঁ। অন্যের বাড়িতে কত দিন থাকব?

সনজু বলল, দশবার কানে ধরে উঠবোস করতে হবে। জুতা চাটতে হবে। তারপরেও যাবে?

শায়লা বলল, আমি নিরুপায়। তুই নিজেই বল আমরা দুইজনই নিরুপায় না?

সনজু কিছু বলল না। চোখ-মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। বড় বোনের গালে চড় দিতে ইচ্ছা করছে। তা সম্ভব না। বড় বোন মায়ের অধিক।

শায়লা উঠে দাঁড়াল। সনজু বলল, তরুকে কিছু বলে যাবে না?

শায়লা বলল, না। ওকে বললে ও হয়তো যেতে দিবে না। নানান কথা বলবে। কি দরকার? তোর দুলাভাই কি বলেছে? কানে ধরে দশ বার উঠবোস আর জুতা চাটলেই হবে?

হুঁ।

জানালা দিয়ে দেখলাম বারান্দায় বসে নাশতা খাচ্ছে। এখন মেজজি কেমন?

ভালো।

শায়লা বলল, তুই আমার সঙ্গে আসবি না। একটু পরে আয়। তোর সামনে কানে ধরে উঠবোস করতে লজ্জা লাগবে।

সনজু বলল, তুমি একাই যাও। আমি দশ মিনিট পরে আসব।

সনজু বাড়ির ছাদে উঠে গেল। ওসমান সাহেবের কিছু লাগবে কি-না খোঁজ নেবে। প্রতিদিন সকালে সে এই কাজটা করে। মাসের শেষে ওসমান সাহেব পাঁচশ করে টাকা দেন। টাকাটা সে খরচ করে না, জমায়। সে তার তোষকে একটা ফুটো করেছে টাকা জমানোর জন্যে।

সিঁড়িঘরের সামনে সনজু থমকে দাঁড়াল। তরু চা খেতে খেতে ওসমান সাহেবের সঙ্গে গল্প করছে। ওসমান সাহেবের হাতেও চা। দুজনের মুখ হাসি হাসি। সনজুর হঠাৎ প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ করল। কোমর ভাঙা এই বুড়োর এত কি গল্প তরুর সঙ্গে? সনজু যেখানে

দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে একটু সরে গেল। এখন আর তরু বা ওসমান সাহেব তাদের দেখতে পাবেন না। অথচ সে দরজার ফাঁক দিয়ে ঠিকই দেখবে।

ওসমান বললেন, আজ তোমাকে অন্যদিনের চেয়েও বেশি আনন্দিত মনে হচ্ছে। কারণ কি?

তরু বলল, কারণ আজ আমাকে দেখতে আসবে।

দেখতে আসবে মানে কি? বিয়ের কনে দেখা?

হুঁ।

ছেলে করে কি?

কাঠুরিয়া। কাঠ কাটে।

ওসমান বললেন, টিম্বার মার্চেন্ট?

তরু বলল, ভদ্র ভাষায় তাই। বাবার উনাকে খুবই পছন্দ। ছেলের নাম আনিস।

আনিস?

তরু বলল, হ্যাঁ আনিস। আমার খুবই অপছন্দের নাম। আমাদের ক্যান্টিনের বয়ের নাম আনিস। তার প্রধান চেষ্টা কোনো এক অপার গায়ের সঙ্গে হাত লাগিয়ে দেয়া যায় কি-না। ভাবটা এরকম যে ভুলে লেগে গেছে।

ওসমান বললেন, বয়কে দোষ দিয়ে লাভ নেই সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির এই স্বভাব আছে।

তরু হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে গলা নিচু করে বলল, আনিস সাহেব বিকেলে চা কোথায় খাবেন জানেন? আপনার এখানে। আপনার মতামত বাবার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আপনি আনিস সাহেবকে ভালোমতো লক্ষ করবেন। তার আইকিউ-এর অবস্থা বুঝবেন।

তুমি বিয়ে করতে চাচ্ছ?

চাচ্ছি। ভালো ঔপন্যাসিকের বিয়ের অভিজ্ঞতা দরকার।

সত্যি সত্যি ঔপন্যাসিক হবার জন্যে বিয়ের অভিজ্ঞতা চাচ্ছ?

হুঁ। আমি কিছুদিন জেলেও থাকতে চাই। জেলের অভিজ্ঞতা লেখালেখিতে সাহায্য করে।

কে বলেছে?

স্যার বলেছেন। যে স্যার চর্যাপদ পড়ান—ড. আখলাক। তাঁর নিক নেম হলো ছোঁক ছোঁক স্যার। তিনি মেয়ে দেখলেই ছোঁক ছোঁক করেন। টিউটোরিয়েলে মেয়েরা সবসময় তার কাছে বেশি নাম্বার পায়।

মেয়েদের জন্যে তো ভালো।

হ্যাঁ ভালো। আপনাকে একটা মজার কথা বলব?

বলো।

সুতাকৃমি অর্থাৎ সনজু অনেকক্ষণ থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখছে।

কতক্ষণ?

বেশ অনেকক্ষণ। আমি এখন কি করব জানেন? ওর দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটব।

ভেংচি কাটবে কেন?

ওর মধ্যে টেনশন তৈরি করার জন্যে। ভেংচি খেয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে এবং সারাক্ষণ চিন্তা করবে ঘটনাটা কি। সাহস করে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে না। সনজু প্রতিদিন চার-পাঁচ বার করে মারা যায়।

ওসমান বললেন, তোমার কথার অর্থ ধরতে পারলাম না। প্রতিদিন চারপাঁচবার করে মারা যায় মানে?

তরু বলল, আপনার কাছ থেকেই শুনেছি শেক্সপিয়ার সাহেব বলেন Cowards die many times before their death. সেই অর্থেই সনজু তিন-চার বার মারা যায়।

তরু সিঁড়িঘরের দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে বিকট ভেংচি কাটল।

ওসমান বললেন, তুমি বেশ ইন্টারেস্টিং মেয়ে। যে তোমাকে বিয়ে করবে সে কখনো বোরও হবে না। তবে তুমি যাকেই বিয়ে করবে তাকে নিয়েই বোরড হবে।

তরু হাতের কাপ নামিয়েই বলল, যাই।

ওসমান বললেন, চা তো শেষ হয়নি। চা শেষ করে যাও।

তরু বলল, আমি এখনই যাব। আমার ক্ষীণ সন্দেহ সুতাকৃমি চলে যায় নি। দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছে, তাকে হাতেনাতে ধরব।

সনজু চলে যায় নি। দরজার আড়ালেই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। তরুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বলল, বড় আপা চলে গেছে।

তরু বলল, কোথায় গেছে? তোমার দুলাভাইয়ের কাছে?

হুঁ।

তালাক না হয়েছিল?

সনজু বলল, মুখের তালাক তো। রাগের মাথায় তালাকে কিছু হয় না। দুলাভাই বলেছেন তালাক হতে কোর্টের অর্ডার লাগে।

তরু বলল, সব ভালো যার শেষ ভালো। ঠিক আছে তুমি যাও। আড়াল থেকে উঁকি দিও না। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করা খুব বাজে ব্যাপার।

সনজু বলল, আপনাকে একটা খবর দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি! আজ দুলাভাইকে শিক্ষা দেয়া হবে।

তুমি শিক্ষা দেবে?

আমার বন্ধুরা দিবে। মেরে তক্তা বানাবে। পেটে একটা ছুরিও ঢুকাবে। এমনভাবে ঢুকাবে যেন কোনো ক্ষতি না হয়। মারা যাবে না।

ঘটনা কখন ঘটবে?

আজ রাতে।

তরু বলল, ঘটনা যে ঘটাবে সে এনাটমি জানে তো? বেকায়দায় ছুরি ঢুকিয়ে মেরে না ফেলে।

সনজু বলল, সে এক্সপার্ট।

নাম কি?

হারুন। সবাই বলে ক্ষুর হারুন।

তরু বলল, ক্ষুরের কাজ ভালো জানে এই জন্যে ক্ষুর হারুন?

হুঁ। হারুন ভাই ভালো গান জানে।

তাই না-কি?

সনজু আগ্রহ নিয়ে বলল, তার আরেক নাম মুনসিগঞ্জের হেমন্ত। মুনসিগঞ্জে বাড়ি তো।

ভেরি গুড। গায়কের হাতে মৃত্যু।

মারা যাবে না। হারুন ভাই হাতের কাজে খুব সাবধান। ঘটনা ঘটামাত্র আপনাকে খবর দেব।

রাত নটা।

তরু বারান্দায় মোড়া পেতে বসে আছে। এখান থেকে বাড়ির গেট দেখা যায়। কে আসছে কে যাচ্ছে সেই খবরদারিও করা যায়। তরুর মেজাজ সামান্য খারাপ। সন্ধ্যাবেলা আনিস এসেছিল। একা না, তার চাচাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তরুকে তাদের এতই পছন্দ হয়েছে যে চাচা মিয়া পাঞ্জাবির পকেট থেকে আংটি বের করে নিমিষেই তরুর হাতে পরিয়ে বলেছেন—সবাই হাত তোলেন। দোয়া হবে। নাটকীয় দোয়া ও দোয়ার মধ্যে গলা কাঁপানো বক্তৃতা আছে। অশ্রুজল আছে।

দোয়া শেষ হবার পর ওসমান বললেন, মেয়ে দেখী অনুষ্ঠানে আমরা সবসময় কিছু ভুল করি।

আনিসের চাচা (নাম কবিরুল ইসলাম চোখ সরু করে বললেন, কি ভুল করি?

ওসমান বললেন, পকেটে করে একটা আংটি নিয়ে যাই। মেয়ে পছন্দ হলে সঙ্গে সঙ্গে আংটি পরিয়ে দেয়া হয়। পছন্দ না হলে গোপনে আংটি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

কবিরুল ইসলাম বললেন, তাতে সমস্যা কি?

ওসমান বললেন, যে মেয়েটির বিয়ে হতে যাচ্ছে তার কিছুই বলার থাকে না। মেয়েটিরও তো পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার থাকতে পারে।

কবিরুল ইসলাম তখন শুরুর দিকে তাকিয়ে থিয়েটারে পাঠ গাইছেন ভঙ্গিতে বললেন, মা তরু। মা তুমিই বলো ছেলে কি পছন্দ হয়েছে? আলাপ খোলাখুলি হওয়া ভালো। আমি প্যাচের আলাপ পছন্দ করি না।

তরু সবাইকে চমকে দিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, বাবা যাকে পছন্দ করেছেন, আমি তাকে কখনো অপছন্দ করব না।

কবিরুল ইসলাম বললেন, মাশাল্লাহ্। মা তোমার কথা শুনে আনন্দ পেয়েছি। কথাবার্তা এরকমই হওয়া উচিত। পরিস্কার। সবাই আরেকবার হাত তুলেন্। দোয়া হবে।

তরুর হবু স্বামী এই পর্যায়ে বলল, চাচা দোয়া তো একবার হয়েছে। আবার কেন?

কবিরুল ইসলাম বললেন, দোয়া তো ভাত খাওয়া না। একবার ভাত খেয়েছি পেট ভরে গেছে আর খাওয়া যাবে না। দোয়া দশ বার করা যায়।

দ্বিতীয় দফার দোয়া আরো আবেগময় হলো। দোয়ার মধ্যে আনিসের বাবা মার কথা চলে এলো। এই শুভক্ষণে তার বড় ভাই অমীরুল ইসলাম জীবিত নাই। পরীর মতো ছেলের বৌ দেখে যেতে পারল না...।

আনিস নামের যুবকটিকে তরুর আসলেই পছন্দ হয়েছে। গম্ভীর ধরনের চেহারা। নির্বোধ তেলতেলে চেহারা না। জিনসের প্যান্টের উপর আকাশি রঙের পাঞ্জাবি পরেছে। দেখতে ভালো লাগছে।

তরু সবার জন্যে চা নিয়ে এসেছে। সবার চা ঠিকঠাক বানানো। শুধু আনিস নামের মানুষটার চায়ে শেষ মুহূর্তে এক টুকরা বরফ দিয়ে দিয়েছে। তার দেখার ইচ্ছা হিম শীতল চা খেয়ে মানুষটা কি করে। সে কি বলবে চাটা ঠাণ্ডা। না-কি এক চুমুক খেয়ে রেখে দেবে। না-কি কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে চা খেয়ে শেষ করবে।

আনিস চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়েই চমকে তরুর দিকে তাকিয়ে কাপ রেখে দিল। দ্বিতীয়বার চায়ের কাপে চুমুক দিল না।

আংটি পরানো অনুষ্ঠান এবং দ্বিতীয় দফা দোয়ার পর কবিরুল ইসলাম তরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, মাগো! তোমরা দুজন যদি প্রাইভেট কোনো কথা বলতে চাও। ছাদে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলো। আমরা কাবিন নিয়ে প্রিলিমিনারি আলোচনা করি।

তারা দুজন ছাদে চলে এলো। আনিস সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে সিগারেট বের করে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, বাঁচলাম।

তরু বলল, আপনি কি গরম এক কাপ চা খেতে চান?

না, থ্যাংক য়্যু।

তরু বলল, প্রাইভেট কোনো কথা থাকলে বলুন।

আনিস বলল, হুইল চেয়ারে বসা ভদ্রলোক কে?

বাবার বন্ধু।

আনিস বলল, ভদ্রলোক সারাক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এর কারণটা কি?

তরু বলল, আপনি সারাক্ষণ ঐ ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ছিলেন এর কারণটা আগে বলুন।

আমি সারাক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম তোমাকে কে বলল?

আপনি সারাক্ষণ তাকিয়ে না থাকলে কি করে বুঝবেন উনি সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

আনিস বলল, মনে হচ্ছে তুমি কথার খেলা পছন্দ করো।

তরু বলল, হ্যাঁ করি।

আনিস বলল, আমি যে সিগারেট খাচ্ছি—সব ধোয়া যাচ্ছে তোমার দিকে, সমস্যা হচ্ছে না তো?

তরু সহজ গলায় বলল, আমি নন-স্মোকার হলে সমস্যা হতো। আমিও সিগারেট খাই।

বলো কি?

এমন চমকে উঠলেন কেন? যে জিনিস ছেলেরা খেতে পারে তা মেয়েরাও পারে। আমাকে একটা সিগারেট দিন।

আনিস বিস্মিত গলায় বলল, সত্যি সিগারেট খাবে?

হ্যাঁ খাব।

হঠাৎ ছাদে যদি কেউ আসে?

এলে দেখবে আমরা দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছি।

আনিস সিগারেটের প্যাকেট বের করল। তরু সহজ ভঙ্গিতেই সিগারেট নিয়ে ব্রাল। লম্বা টান দিয়ে বলল, বাবার বন্ধু ঐ পঙ্গু মানুষটার নাম ওসমান। তিনি একা থাকেন। কালেভদ্রে তাঁর স্ত্রী তাকে দেখতে আসেন। আর্ট কলেজের এক তরুণী তাঁকে ছবি আঁকা শেখাত। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সেও আসে না। জৈবিক কারণেই এখন এই বৃদ্ধ যে কোনো তরুণীর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাবে। তাই না?

আনিস বলল, তুমি এইসব কি বলছ!

তরু বলল, উনি কেন অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন সেটা ব্যাখ্যা করলাম। আমাকে আংটি পরিয়ে দেবার ব্যাপারটা উনার একেবারেই পছন্দ হয় নি। এখন বুঝতে পারছেন?

আনিস বলল, বুঝতে পারছি, তুমি অদ্ভুত মেয়ে।

আমি একজন ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিকরা কিছুটা অন্য রকম হন। এটাই স্বাভাবিক।

ঔপন্যাসিক মানে? তুমি উপন্যাস লিখছ নাকি।

হুঁ। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখছি।

ছাপা হয়েছে?

না। বিয়ের পর স্বামীর পয়সায় ছাপব। প্রকাশকরা নতুন লেখকের লেখা ছাপে না।

আনিস ইতস্তত করে বলল, কিছু মনে করো না। আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়েছে?

তরু বলল, না।

না কেন?

আপনার সঙ্গে বিয়ে হলে আপনি আমাকে সিগারেট খেতে দেবেন না। কেউ আমার দিকে তাকালে ঈর্ষায় জ্বলে যাবেন। আপনার সঙ্গে জীবন-যাপন হবে যন্ত্রনার। আমাকে আরেকটা সিগারেট দিন। ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকবেন না। আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো চেইনস্মোকার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে চেনেন তো? কবি এবং ঔপন্যাসিক।

আনিস বলল, এখন সিগারেট খাওয়াটা ঠিক হবে না। যে কোনো মুহূর্তে চাচা বের হয়ে আসবেন। সিগারেট হাতে তোমাকে দেখলে ধাক্কার মতো খাবেন।

আপনি ধাক্কা খাচ্ছেন না?

কিছুটা তো খাচ্ছিই।

তরু হাসি হাসি মুখে বলল, আংটি খুলে দেব? খুলে দেই? গোপনে। পকেটে করে নিয়ে চলে যান।

আনিস কিছু বলার আগেই তার চাচা বের হয়ে এলেন। আনন্দিত গলায় বললেন, মাগো! যাই? মোটামুটি সব ফাইন্যাল করে গেলাম। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।

তরু ঘড়ি দেখল। তার হাতে ঘড়ি নেই। মোবাইল ফোন। ফোন টিপে ঘড়ি দেখা। এখন বাজছে এগারোটা বিশ।

সনজুর দুলাভাইকে গেট খুলে বাসায় ফিরতে দেখা যাচ্ছে। তার এক হাতে দড়িতে বাধা কিছু সাগর কলা অন্য হাতে ব্রাউন পেপারের ব্যাগ। তার পেটে কেউ ছুরি বসায় নি।

দুলাভাইকে দেখে সনজু ছুটে এসে হাতের বাজার নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। দুলাভাইকে সুস্থ অবস্থায় দেখে সে আনন্দিত না দুঃখিত তা এত দূর থেকে বুঝা যাচ্ছে না। তরু আরো কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে থাকবে না-কি ঘরে ঢুকে উপন্যাসে হাত দেবে বুঝতে পারছে না। নতুন উপন্যাস শুরু করার চেয়ে ছোটগল্প লেখাটা মনে হয় সহজ। আশেপাশে যা ঘটছে তা নিয়ে ছোটগল্প। একটা গল্পের নাম কনে দেখা। সেখানে একটি মেয়েকে পছন্দ করে হাতে আংটি পরিয়ে দেয়া হবে। তারপর দেখা যাবে মেয়েটা ড্রাগ এডিক্ট। পাত্রপক্ষ পিছিয়ে যাবে শুধু পাত্র পিছাবে না। সে আধাপাগল হয়ে যাবে মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্যে।

চিন্তা শেষ করার আগেই সুনজু উপস্থিত হলো। তরু বলল, ঘটনা তো ঘটে নাই।

সনজু বলল, আগামী বুধবার ঘটবে। আজ হারুন ভাইয়ের একটা জরুরি কাজ পড়ে গেছে। উনার বড় বোনের মেয়েটা খাট থেকে পড়ে মাথায় ব্যথা পেয়েছে। তাকে হাসপাতালে নিতে হয়েছে। বাচ্চাটার বয়স দেড় বছর। হারুন ভাই তাকে খুবই পছন্দ করেন।

তরু বলল, বুধবারে ঘটনা ঘটবে তো?

অবশ্যই। উনাকে কিছু খরচও দিয়েছি। এক হাজার টাকা দিয়েছি। অন্যের কাছ থেকে উনি অনেক বেশি টাকা নেন। আমি বন্ধু বিধায় নামমাত্র টাকা নিয়েছেন। আপনার কোনো কাজ লাগলে বলবেন করায়ে দেব।

তরু হাই তুলতে তুলতে বলল, ক্ষুর চালাচালির কাজ লাগবে না তবে অন্য একটা কাজ করে দিলে ভালো হয়।

বলেন কি কাজ। কাল দিনের মধ্যে করে ফেলব।

একটা নকল ছবি বানিয়ে দিতে হবে। কম্পিউটারে খুব সহজেই কাজটা করা যায়। আমি আমার একটা ছবি দিব আর ওসমান চাচার একটা ছবি দেব। দুটা ছবি মিলিয়ে এমন করতে হবে যে নকল ছবিটাতে দেখা যাবে আমি ওসমান চাচার কোলে বসে আছি। পারবে না?

সনজু জবাব দিল না। তাকিয়ে রইল। তরু বলল, আমি অনেকগুলো ছবি দেব যেটা কাজে লাগে। সকালে এসে ছবি নিয়ে যেও।

# ৮. বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর থেকে খালেক মেয়েকে তরু ডাকছেন না। ভালো নামে মিষ্টি করে ডাকছেন–মা, শামসুন নাহার। মেয়ের সঙ্গে তিনি আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় নিচ্ছেন। বাইরে কাজে গেলে টেলিফোন করছেন। ঘুমুতে যাবার আগে মেয়ের ঘরে বসে পান খাচ্ছেন। তরু নিজেও বাবার সঙ্গে পান খাচ্ছে। তরু রাতের পান খাওয়ার একটা নামও দিয়েছে—নৈশকালিন পান উৎসব।

পান উৎসবে কথাবার্তা যা হয় সবই বিয়ে নিয়ে। খালেকের মাথায় মেয়ের বিয়ের নানান পরিকল্পনা। পরিকল্পনা নিয়ে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগে। তখন তাঁকে যথেষ্ট উত্তেজিত মনে হয়। যদিও শুরু বেশিরভাগ পরিকল্পনাই বাতিল করে দেয়।

শামসুন নাহার, মা চল বাপ-বেটি মিলে কোলকাতা যাই।

তরু বলল, এই গরমে কোলকাতা যাব কেন?

বিয়ের বাজার করব। তোর শাড়ি, জামাইয়ের জন্যে পাঞ্জাবি। স্যুটের কাপড়।

শাড়ি-পাঞ্জাবি, স্যুটের কাপড় সবই দেশে পাওয়া যায়। খামাখা কোলকাতা যাবার দরকার কি?

সবাই তো যায়।

আমি এর মধ্যে নাই।

না গেলে দেশেই কেনাকাটা শুরু করে দে। সময় তো বেশি নাই। কাল থেকে শুরু কর। কাল দিন ভালো—বৃহস্পতিবার।

তরু বলল, আচ্ছা। শুরু করব।

বিয়ের রান্নার জন্যে সিদ্দিক বাবুর্চিকে খবর দিয়েছি। তার মতো ভালো কাচ্চি পাক-ভারত উপমহাদেশে কেউ রানতে পারে না।

কাচ্চি বিরানি খাব না বাবা।

কি খেতে চাস?

খাসির রেজালা–মুরগির রোস্ট।

গরুর ঝাল মাংস থাকবে?

থাকুক।

কিছু বুড়ো মানুষ আছে—বিয়ে বাড়ির রেজালা পোলাও খেতে চায় না। তাদের জন্যে সাদা ভাত, সজি, ডাল, মুরগির ঝোল। ঠিক আছে না?

ঠিক আছে।

বাচ্চাদের জন্যে চায়নিজ আইটেম করব? বাচ্চারা চায়নিজ পছন্দ করে। ফ্রয়েড রাইস, চায়নিজ আর স্প্রিং ফ্রায়েড দিবেন।

আইসক্রিম থাকবে না?

সবার জন্যে থাকবে না। শুধু বাচ্চাদের জন্যে। সবাইকে আইসক্রিম খাওয়া পুষাবে না।

খালেক নিজেই দশ বারোটা দাওয়াতের কার্ড দেখে একটা কার্ড ছাপিয়ে এনেছে। কার্ডের ছবি একটা ঘড়ি পরা ছেলের হাত সোনার চুড়ি পরা একটা মেয়ের হাত ধরে আছে। দুজনের হাত থেকে ফুলের একটা মালা ঝুলছে। এখানেই শেষ না, দুই হাতের উপর রঙিন প্রজাপতি উড়ছে। প্রজাপতির ডানায় লেখা শুভ বিবাহ।

আনিস নামের যুবকটির সঙ্গে একদিন তরু চায়নিজ খেয়ে এসেছে। সব হবু স্বামী স্ত্রীকে মুগ্ধ করার চেষ্টায় থাকে। আনিস তার ব্যতিক্রম না। সে রীতিমত কুইজ প্রোগ্রাম শুরু করল।

তরু আফগানিস্তান সম্পর্কে কি জানো?

তেমন কিছু জানি না।

আফগানিস্তান হচ্ছে এমন এক দেশ যাকে কোনো বিদেশি দেশ দখল করতে পারে নি।

তরু বলল,ও রকম দেশ তো আরো আছে। চীন এবং আবিসিনিয়া। এই দুটি দেশকেও কেউ দখল করতে পারে নি।

আনিস বলল, কে বলেছে তোমাকে?

পঙ্গু বলেছে।

পঙ্গুটা কে?

ছাদে যিনি থাকেন। পঙ্গু চাচা।

তাকে তুমি পঙ্গু চাচা ডাকো না-কি?

তরু বলল, যে পঙ্গু তাকে পঙ্গু ডাকব না?

খাবার চলে এসেছে। আনিস আবারো কুইজ প্রোগ্রামে চলে গেল।

তরু চায়নিজ রান্নায় বিশেষত্ব কি জানো?

তরু বলল, বিশেষত্ব হচ্ছে ঠাণ্ডা হলে এই খাবার খাওয়া যায় না।

আনিস বলল, ভালো ধরেছ।

তরু বলল, আপনি কি বলতে পারবেন ঠাণ্ডা হলে কেন এই খাবার খাওয়া যায় না?

না।

তরু বলল, চায়নিজ খাবার মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট নামের লবণ দেয়া হয়। ঠাণ্ডা হলে লবণটা জমাট বেঁধে যায়। খাবারের স্বাদ নষ্ট করে দেয়।

আনিস বলল, কে বলেছেন? তোমার পঙ্গু চাচা?

হুঁ।

তিনি কি তোমার টিচার না-কি?

জ্ঞানী মানুষ সবারই টিচার। আপনি তার কাছে গেলে আপনাকেও তিনি অনেক কিছু শেখাবেন।

আনিস বলল, বুড়োটার নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবে না। বুড়োটাকে কেন জানি সহ্য করতে পারছি নি। বুড়ো ছাড়া অন্য যে কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করো। তোমার একটা লেখা আনতে বলেছিলাম এনেছ?

এনেছি। গল্প এনেছি। গল্পের নাম সিন্দাবাদের দৈত্য।

রূপকথার গল্প?

আধুনিক রূপকথার গল্প। মুখে বলব?

বলো।

তরু বলল, অল্পবয়েসি একটা মেয়ে একজন বৃদ্ধের প্রেমে পড়েছে। কঠিন প্রেম। মেয়েটা বুদ্ধিমতী সে বৃদ্ধকে বিয়ে করবে না। কিন্তু প্রেমের কারণে বৃদ্ধটাকে ঘাড় থেকে ফেলতেও পারছে না। বুড়োটা এখন তার কাছে সিন্দাবাদের দৈত্য। গল্পের আইডিয়া সুন্দর না?

আনিস শুকনো মুখে বলল, হুঁ।

তরু বলল গল্পের শেষটা বলব? মেয়েটা চায়ের সঙ্গে সায়ানাইড মিশিয়ে বুড়োটাকে খেতে দেয়।

সায়ানাইড?

হ্যাঁ সায়ানাইড। পটাশিয়াম সায়ানাইড। কেমিক্যাল ফর্মুলা হচ্ছে KCN. জানেন আমার কাছে এক কৌটা পটাশিয়াম সায়ানাইড আছে। দশ গ্রামের মতো। আমার এক বান্ধবী কেমিস্ট্রি পড়ে। তার কাছ থেকে নিয়েছি। নিজে কখনো খাব না। অন্যদের খাওয়াব।

আনিস বলল, এখন আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে তুমি বিয়েটা ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করছ। সরাসরি বলো তো তুমি কি চাও বিয়েটা হোক?

না।

কারণ কি ঐ পঙ্গু বুড়ো? সিন্দাবাদের ভূত?

হুঁ। চা দিতে বলুন তো। দুপুরে খাবার পর আমি সবসময় চা খাই।

আনিস গম্ভীর মুখে চায়ের অর্ডার দিল।

তরু বলল, আপনি তো কিছুই খান নি।

আনিস বলল, আমার খাবার নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। চা শেষ করো। চলো তোমাকে বাসায় নামিয়ে দেই। তরু আরেকটা কথা শোনো। বিয়ে কিন্তু আমি ভাঙব না। বিয়ে ভাঙতে হলে তোমাদের ভাঙতে হবে।

তরু বলল, আমি একজন বুড়ো মানুষের প্রেমে খাবি খাচ্ছি এটা শুনেও বিয়ে ভাঙবেন না?

আনিস বলল, না। কারণ তুমি বুড়োর প্রেমে খাবি খাওয়ার মেয়ে না। আমার সঙ্গে জটিল খেলা শুরু করেছ। আমি যথেষ্ট বেকুব বলে খেলাটা ধরতে পারছি না। ভালো কথা, তোমার ঐ ছেলে এসেছিল আমার কাছে।

কোন ছেলে?

নাম সনজু। দুটা ছবি নিয়ে উপস্থিত! একটাতে তুমি বুড়োটার কোলে বসে আছ। আরেকটাতে বুড়ো তোমার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। ফটোশপের কাজ, খুবই খারাপ হয়েছে। দেখেই বুঝা যায় নকল ছবি।

ছবি দেখার পর আপনি কি করলেন?

আমি ঐ ছেলের গলা চেপে ধরলাম। এমন চাপ দিলাম যে তার চোখ কোঠর থেকে বের হবার জোগাড়। সে সঙ্গে সঙ্গে সব স্বীকার করল। কোন ফটোগ্রাফের দোকান থেকে কাজটা করেছে তার নাম বলে চোখের পানি, নাকের পানিতে একাকার।

আপনি তো মহাগুণ্ডা।

মহাগুণ্ডা না। ছোটখাটো গুণ্ডা। চল উঠি—

তরু বলল, আপনার তাড়া থাকলে আপনি চলে যান। আমি আরো কিছুক্ষণ বসব। পরপর চার কাপ চা খাব। এদের চা-টা খুব ভালো হয়েছে। আপনি এই ফাঁকে আমার গল্পটা পড়ে ফেলুন।

তরু চা খাচ্ছে। বিরক্ত মুখে আনিস গল্প পড়তে শুরু করেছে। গল্পের নাম-সিন্দাবাদের দৈত্য না। নাম—-মুন্সিগঞ্জের হেমন্ত। আঠারো-উনিশ বছরের একটা ছেলে যে হেমন্তের মতো গান গায়। কনট্রাক্টে মানুষের পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়।

গল্প শেষ করে আনিস বলল, খুবই সুন্দর গল্প। বিশ্বাসই হচ্ছে না তোমার লেখা। গল্পটা দিয়ে নাটক বানালে অসাধারণ নাটক হবে। আমি করব। মুন্সিগঞ্জের হেমন্তের রোল। তরু তুমি নাটক লিখতে পারো?

না। আমার চা খাওয়া শেষ। আমি এখন উঠব।

আনিস আগ্রহ নিয়ে বলল, কিছুক্ষণ বসে গল্প করি।

তরু বলল, একজন লেখকের সঙ্গে আমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উনি একটা হোটেলে আছেন। হাতে-কলমে আমাকে গল্প লেখা শেখাবেন। এই কাণ্ড যে তিনি করবেন তা লেখকের স্ত্রী জানেন না। তবে তাকে খবর দেয়া হয়েছে। তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হবেন। আমার ধারণা তিনি লেখককে কানে ধরে নিয়ে যাবেন। অসাধারণ একটা দৃশ্য। আপনি দেখতে চাইলে হোটেল করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন।

কি বলছ তুমি?

আপনার মোবাইল টেলিফোনে ক্যামেরা আছে না। ফটাফট কয়েকটা ছবি তুলতে পারেন।

তোমার কথা আমার একবিন্দু বিশ্বাস হচ্ছে না।

তরু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

লেখকের নাম শাহেদ খান। বেল টেপার পর তিনি দরজা খুলে দিলেন। তরু ঢোকা মাত্র দরজা বন্ধ করে দিলেন। তার নিশ্বাস কিছুটা ভারী। কপালে ঘাম।

তরু! কিছু খাবে? চা দিতে বলব। চা খাবে?

না।

না চা খেয়ে এসেছি।

হাতে সময় নিয়ে এসেছ তো। সাহিত্যের জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা অনেক সময় লাগে।

আপনি যতক্ষণ থাকতে বলবেন থাকব।

গুড। ভেরি গুড।

আমি একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখা শুরু করেছি। খাতাটা নিয়ে এসেছি। পড়ে শুনাব?

অবশ্যই পড়ে শুনাবে। তবে তরু শোনো ডিটেকটিভ উপন্যাস কিন্তু সাহিত্য না। ডিটেকটিভ উপন্যাস হচ্ছে Craft. পৃথিবীর কোনো মহান লেখক ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখেন নি।

এডগার এলেন পো তো লিখেছেন। তিনি বড় লেখক না।

উনি বড় লেখক। তবে বিপর্যস্ত লেখক। মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করতেন।

আপনিও তো পছন্দ করেন।

নারী হচ্ছে চালিকা শক্তি। প্রাচীন মানুষ যখন গুহায় ছবি আঁকত তখন আলো ধরে রূপবতী নগ্ন পরীরা দাঁড়িয়ে থাকত।

নগ্ননারী দাঁড়িয়ে থাকত জানলেন কিভাবে?

অনুমান করছি। একজন লেখকের অনুমান সত্যের খুব কাছে থাকে। বাহ্ তোমার হাতের আঙ্গুল তো খুব সুন্দর। সাহিত্যের ভাষায় এই আঙ্গুলকে বলে চম্পক আঙ্গুলি। দেখি তোমার হাতটা।

||||||||| তরু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, স্যার আমি আপনার এখানে আসার আগে ম্যাডামকে টেলিফোন করে অনুমতি নিয়েছি। ম্যাডামও মনে হয় আসবেন।

শাহেদ খান হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখ হঠাৎ ছাই বর্ণ হয়ে গেল। কলিংবেল বাজছে। ঘন ঘন বাজছে। কেউ মনে হয় এসেছে। তরু বলল, স্যার! ম্যাডাম মনে হয় এসেছেন। দরজা কি খুলব?

# ৯. ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে

রাত তিনটা।

ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। তরুদের বাসার সামনে আধমরা কাঁঠাল গাছের ডাল মড়াৎ করে ভাঙল। ভাঙা ডাল পড়ল ড্রাইভার, দারোয়ানদের একতলা টিনের চালে। তাদের হৈচৈ এবং বজ্রপাতের শব্দে খালেক জেগে উঠলেন। ইলেকট্রিসিটি নেই, চারদিক ঘন অন্ধকার। শুধু তরুর ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। খালেক মেয়ের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। ব্যাকুল গলায় বললেন, তরু কি হয়েছে রে মা? টেনশনের কারণে তিনি ভুলে গেলেন যে মেয়েকে ইদানীং তিনি পোশাকি নামে শামসুন নাহার ডাকছেন।

তরু দরজা খুলল। হাই তুলতে তুলতে বলল, তেমন কিছু হয় নি বাবা। ঝড়ে কাঁঠাল গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়েছে। এখন আর হৈচৈয়ের শব্দ আসছে না কাজেই সব ঠিক ঠিক। পশ্চিম রণাঙ্গন শান্ত।

খালেক বিস্মিত হয়ে বললেন, পশ্চিম রণাঙ্গন শান্ত মানে কি?

একটা উপন্যাসের নাম। লেখক জার্মান। তাঁর নাম এরিখ মেরিয়া রেমার্ক! তার আরও একটা বিখ্যাত বই আছে নাম থ্রি কমরেডস। এই বইটা পড়তে হলে বড় সাইজের টাওয়েল লাগে।

টাওয়েল লাগবে কেন?

বই পড়তে শুরু করলে খুব কাদতে হবে। এমনই কষ্টের বই। টাওয়েল লাগবে চোখের পানি মুছতে।

তুই রাত জেগে কি করছিস?

লিখছি।

কি লিখছিস?

একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস। এখন খুব ক্রিটিক্যাল জায়গায় আছি। এক স্বামী তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে মারছেন। বেচারি ছটফট করছে আর তিনি বলছেন, সীমা! আর একটু কষ্ট করো। এক্ষুনি তোমার কষ্টের শেষ হবে। তুমি শান্তিতে ঘুমাবে। এই বলেই তিনি ঘুমপাড়ানি গান গাইতে শুরু করলেন—

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো
খাট নাই পালংক নাই পিঁড়ি পেতে বস।

খালেক বললেন, তোর তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যতই দিন যাচ্ছে তুই ততই তোর মার মতো হয়ে যাচ্ছিস।

মার মাথা খারাপ ছিল?

অবশ্যই ছিল।

কখনো তো বলো নি।

অসুখ-বিসুখের কথা কি বলে বেড়ানো ঠিক। তাছাড়া আমি নিজেও শুরুতে ধরতে পারি নি।

তরু বলল, বাবা আমার ঘরে এসে বসো। কিছুক্ষণ গল্প করি। চা খাবে? চা বানিয়ে আনি? চা খেতে খেতে বাপ-বেটিতে গল্প।

খালেক বললেন, শামসুন নাহার, তোমার আচার-আচরণ আমার কাছে মমাটেই ভালো মনে হচ্ছে না।

তরু বলল, বাবা আমাকে শামসুন নাহার ডাকার আর প্রয়োজন নেই। আমার বিয়ে ভেঙে গেছে। আনিস সাহেব বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন।

বলিস কি? গত পরশু না চায়নিজ খেতে গেলি। উলটপালট কি করেছিস?

তেমন কিছু করি নি। তবে উনার ধারণা আমি ডেনজারাস মেয়ে। আমাকে বিয়ে করলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে।

কেন এ রকম ধারণা হলো? কি সর্বনাশের কথা।

তরু বলল, এই প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না বাবা। তুমি মার কথা বলো।

খালেক বললেন, তার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

তরু বলল, তাহলে পঙ্গু চাচার কথা বলো।

পঙ্গু চাচাটা কে?

ওসমান চাচা।

তাকে তুই পঙ্গু ডাকিস?

বাবা সরি। হঠাৎ হঠাৎ ডাকি।

খালেকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিস্ময়ের প্রধান কারণ তরুর মা উনাকে হঠাৎ হঠাৎ ডাকত পঙ্গু ভাই। এই নিয়ে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে অনেক রাগারাগি করেছেন। সে হাসতে হাসতে বলেছে, আচ্ছা যাও এখন থেকে আর পঙ্গু ভাই ডাকব না। ডাকব গঙ্গু ভাই।

খালেক বললেন, গঙ্গু ভাইটা কি?

তরুর মা হেসে ভেঙে পড়তে পড়তে বললেন, গঙ্গু হচ্ছে পঙ্গুর কাজিন।

মহিলার কথাবার্তার কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। তরু অবিকল তার মার মতো হয়েছে। তার কথাবার্তারও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। মা ছাড়া সংসারে বড় হয়েছে। কিছু সমস্যা তো হবেই। তাই বলে এতটা? তার বিয়ে ভেঙে গেছে বলে যা বলছে তাও মনে হয় ঠিক না। খালেক ঠিক করলেন সকালে নাশতা খেয়েই তিনি আনিসের কাছে যাবেন। গোলমাল কিছু হয়ে থাকলে ঠিক করবেন।

ঘরের মোমবাতি তলানিতে চলে এসেছে। তরু নতুন নোম আনতে গেছে। ফিরতে দেরি করছে। খালেক অস্থির বোধ করছেন।

বাবা নাও চা খাও। চা বানাতে গিয়ে দেরি করেছি।

মোমবাতি পাস নাই?

পেয়েছি। জ্বালাব না। অন্ধকারে তোমার সঙ্গে গল্প করব। বাবা তুমি জানো অন্ধকারে মিথ্যা কথা বলা যায় না।

জানি না তো। কে বলেছে?

সাইকিয়াট্রিস্টরা বলেন। পুলিশের যাবতীয় ইনটারোগেশন এই কারণেই রাতে হয়।

চা খেলে রাতের ঘুমের দফা রফা হবে তার পরেও খালেক চায়ে চুমুক দিলেন। মোম নিভে গেছে। হঠাৎ অন্ধকার হবার জন্যেই কি বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে?

তরু বলল, বাবা তোমার কাছে একটা ইনফরমেশন চাই। মামার বাড়ির কেউ কখনো এ বাড়িতে আসেন না কেন?

খালেক বললেন, সেটা তারা জানে কেন আসে না। তাদেরকে কোলে করে এ বাড়িতে আনার তো আমার দরকার নাই। আমি তাদের খাইও না, পরিও না। মোমবাতি জ্বালা। মোমবাতি ছাড়া অন্ধকারে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। নিজেকে চোর চোর লাগছে।

তরু মোমবাতি জ্বালাল আর তখনই বসার ঘরের দরজায় ডাকাত পড়ার মতো শব্দ হতে লাগল। দরজা ভেঙে ফেলার মতো অবস্থা।

খালেক উঠে গেলেন। মোমবাতি হাতে পেছনে পেছনে গেল তরু। দরজা খুলে দেখা গেল সনজু তার বোনকে নিয়ে এসেছে। বোন থরথর করে কাঁপছে। অপ্রকৃতস্থের মতো তাকাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে।

খালেক বললেন, কি হয়েছে।

সনজু বলল, দুলাভাই মারা গেছেন।

কি সর্বনাশ, কখন মারা গেছে।

সনজু বলল, কখন মারা গেছেন জানি না। এই মাত্র মোবাইলে খবর এসেছে। কে যেন তার পেটে ছুরি মেরেছে। লোকজন ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, সেখানে মারা গেছেন।

খালেক হতভম্ব গলায় বললেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজিউন। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলো। চলো হাসপাতালে যাই। ধৈর্য ধরো। বিপদে ধৈর্যের মতো কিছু নাই।

ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। বৃষ্টি থামে নি। তরু বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে বৃষ্টি দেখছে। চারটার মতো বাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকাল হবে। তরু ঠিক করেছে বারান্দায় বসেই আজ সকাল হওয়া দেখবে। একজন ঔপন্যাসিকের সকাল হওয়া দেখা খুব জরুরি। সে কখনো সকাল হাওয়া দেখে নি। তার ঘুম নটার আগে ভাঙে না। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সূর্য ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠতেন। আয়োজন করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির বারান্দায় বসে সূর্য ওঠা দেখতেন। কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে থেকে বিখ্যাত সব কবিতা লিখতেন যেগুলি পাঠ্য হয়ে যেত।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান

কবিতা ছাপিয়ে কাজের মেয়ের গলা পাওয়া গেল। আফা আপনে এইখানে, আমি সারাবাড়ি খুঁজতেছি। এত ঘটনা যে ঘটছে আমি কিছুই জানি না। ঝড়-তুফান যে হইছে হেই খবরও নাই। আফা মার্ডার নাকি হইছে?

হুঁ।

কেমন দেশে বাস করি দেখছেন আফা? পথেঘাটে মার্ডার। চা খাবেন আফা।

খেতে পারি।



www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

গত কাইলই লোকটারে দেখছি চায়ের কাপে টোস্ট বিসকুট ডুবায়া চা খাইতেছে—আইজ মার্ডার। বারান্দায় বইসা আছেন কেন আফা, বৃষ্টির ছিট আসতাছে।

আসুক তুমি চা নিয়ে এসো।

সনজুদের বাসার দরজা খোলা। ভেতরে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। কেউ যেন সুইচ টিপে বাতি জ্বালাল। ঐ বাসায় কেউ নেই। সবাই হাসপাতালে। তাহলে বাতি কে জ্বালাবে? ঘরের ভেতর থেকে কুচকুচে কালো রঙের একটা বিড়াল এসে বারান্দায় আলোতে বসেছে। এই বিড়ালটাকে তরু আগে দেখেনি। মনে হচ্ছে ভৌতিক বেড়াল। বিড়ালটাই কি ঘরের ভেতরের বাতি জ্বালিয়ে বারান্দায় এসে আলোতে বসেছে? এডগার এ্যালেন পোর বিড়াল?

আফা! চা নেন। মোবাইলটা ধরেন। একটু পরে পরে বাজতাছে।

তরু চায়ের কাপ এবং মোবাইল হাতে নিল। কাজের মেয়ে বলল, কারেন্ট আসছে আফা। বারিন্দার বাতি জ্বালায়ে দিব?

তরু বলল, না।

সে চায়ের কাপে চুমুক দিল। বিড়ালটা তাকাচ্ছে তার দিকে। তরু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। বেড়ালটাকে ঘিরে যে রহস্যময়তা তৈরি হয়েছিল তার অবসান হয়েছে। কারেন্ট এসেছে বলেই সনজুদের ঘরের বাতি জ্বলে উঠেছে। বেড়ালের এখানে কোনো ভূমিকা নেই। তরুর মোবাইল টেলিফোন আবার বেজে উঠেছে।

সনজু হবার সম্ভাবনী। হত্যাকাণ্ড কিভাবে ঘটল তার বর্ণনা দেবার জন্যে সনজু নিশ্চয়ই ব্যস্ত হয়ে আছে। হত্যাকারী মৃতদেহের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করে। মুন্সিগঞ্জের হেমন্ত হয়তো হাসপাতালের সামনেই হাঁটাহাঁটি করছে। সনজু এক পর্যায়ে হেমন্ত বাবুকেও টেলিফোনে ধরিয়ে দিতে পারে।

তরু টেলিফোনের বোতাম টিপে বলল, হ্যালো কে?

ওপাশে ধরেছেন লেখক স্যার। তিনি থমথমে গলায় বললেন, তরু! তুমি এই কাজটা কেন করলে?

তরু বলল, কোন কাজটা স্যার?

কোন কাজটা তুমি জানো না? স্টুপিড মেয়ে।

গালাগালি করছেন কেন স্যার। লেখকের মুখে গালাগালি মানায় না। লেখকরা মিষ্টি করে কথা বলবেন। স্যার আপনি কল্পনা করুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কারো উপর রাগ করে বললেন—এই শালা। দূর হ! তখন কেমন লাগবে?

তরু! তুমি অতিরিক্ত চালাক সাজার চেষ্টা করছ। তোমাকে দোষ দিচ্ছি। এই সময়কার তরুণী মেয়েদের জেনারেল স্টাইল অতিরিক্ত চালাকি করা। তারা বন্ধুবান্ধবদের সামনে অবলীলায় বলবে—পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা কর। আমি মুততে গেলাম। বলে বাথরুমে ঢুকবে এবং ভাববে অতি স্মার্ট একটা কাজ করা হলো।

ঠিক বলেছেন স্যার।

শোনো তরু! আমাকে উদ্ধার করো। আমার স্ত্রী যে কি সমস্যা তৈরি করেছে এবং ভবিষ্যতে কি ভয়ংকর কাজকর্ম করবে বা তোমার কল্পনাতেও নেই। আমার অনুরোধ তুমি আমাকে উদ্ধার করো।

কিভাবে উদ্ধার করব?

আমার স্ত্রীকে বলবে সবই তোমার সাজানো। তুমি একবার আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিলে, আমি তখন খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম বলেই এইভাবে শোধ নিয়েছ।

বললেই বিশ্বাস করবেন?

অবশ্যই বিশ্বাস করবে। সে বিশ্বাস করার জন্যেই অপেক্ষা করছে। বিশ্বাস করা ছাড়া তার আর কোনো সেকেন্ড অপশন নেই।

স্যার আমি আজ দিনের মধ্যেই বলব।

থ্যাংক য়্যু। ফ্রম মাই হার্ট থ্যাংক য়্যু।

তরু বলল, স্যার আপনার সঙ্গে আমি যা করেছি তার জন্যে এখন লজ্জা লাগছে। আপনি চাইলে আমি কিছু নিরিবিলি সময় আপনার সঙ্গে কাটাব। এবার আর ম্যাডাম উদয় হবেন না। ঐ হোটেলেও যেতে পারি। আপনার নিশ্চয়ই বুকিং আছে। বুকিং আছে না স্যার?

হুঁ।

তরু গলা নামিয়ে বলল, ম্যাডাম স্বপ্নেও ভাববেন না যে ঘটনার পরদিনই আবার আপনি হোটেলে যাবেন এবং কাউকে ডেকে পাঠাবেন। স্যার আজ কি আসব?

তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

স্যার বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। আপনি ইশারা করলেই আমি আসব।

আগে তুমি তোমার ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে তাকে ঠিক করে তারপর দেখা যাবে।

যদি কথা বলে ঠিক করতে পারি তাহলে কি আসব? কখন আসব বলুন?

বিকালের দিকে আসতে পারো If You really want that.

বিকাল মানে কখন? সময়টা বলুন।

হঠাৎ তুমি এত ব্যস্ত হলে কেন?

আপনার উপর যে অন্যায়টা আমি করেছি তার প্রতিকার করতে চাই। তাছাড়া স্যার, আমি আপনার চোখে তৃষ্ণা দেখেছি। লেখকের চোখের তৃষ্ণা খুব খারাপ জিনিস। চোখে তৃষ্ণা নিয়ে লেখক লিখতে পারেন না।

তুমি চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে চলে এসো।

থ্যাংক য়্যু স্যার।

তরু টেলিফোন নামিয়ে ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে ভোরের আলো ফুটছে। তরু আগ্রহ নিয়ে ভোর হওয়া দেখছে।

খালেক বিকালের মধ্যে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেললেন। ডাক্তারের রিপোর্ট, সুরতহাল, কবর দেয়ার জন্যে ওসি সাহেবের অনুমতি সব জোগাড় হয়ে গেল। আজিমপুর গোরস্থানে কবর দিয়ে তিনি বাসায় ফিরে মোটামুটি হাসিমুখে তরুকে বললেন, কড়া করে এক কাপ চা দে তো মা। চা খেয়ে গরম পানিতে হেভি গোসল দেব।

তরু বলল, বাবা! তোমাকে আনন্দিত মনে হচ্ছে কেন?

খালেক বললেন, অস্বাভাবিক মৃত্যু কত ভয়াবহ এটা জানিস? নানান ফ্যাকড়া। পুলিশ থাকে টাকা খাওয়ার ধান্ধায়। তাদের সামাল দেয়া বিরাট ব্যাপার।

তরু বলল, তুমি An expert হেডমাস্টারের মতো সব ঝামেলা শেষ করে দিয়েছ? কনগ্রাচুলেশন।

খালেক সরু চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়ের তাকানোর ভঙ্গি, কথাবার্তার ভঙ্গি সবই কেমন অদ্ভুত লাগছে।

তরু বাবাকে চা এনে দিল। মগ ভর্তি চা। তরু বলল, আরাম করে চা খাও বাবা। গিজার কাজ করছে না। চুলায় গরম পানি হচ্ছে। দশ মিনিট পরেই গোসল করতে পারবে। এই দশ মিনিট আমার সঙ্গে গল্প করো।

কি গল্প করব?

পঙ্গু চাচা তোমার বাড়িতে কেন থাকেন? তার টাকা-পয়সা ভালোই আছে। তারপরেও এখানে কেন পড়ে আছেন। এই ব্যাপারটা বলো। খালেক বললেন, আজকের দিনে এইসব কথা কেন তুলছিস?

তরু বলল, প্রায়ই তুলতে চাই। তোলা হয় না। অনেকগুলি খটকা নিয়ে বড় হয়েছি তো বাবা। খটকা ভালো লাগে না।

কি খটকা?

এই যেমন পঙ্গু চাচা এত জায়গা থাকতে তোমার বাড়ির ছাদে থাকেন কেন? এটা ছাড়াও খটকা আছে।

আর কি?

মার এবং খালা দুজনের মৃত্যুদিন তুমি ঘটা করে করো। মিলাদ হয়। কাঙালি ভোজ হয় এবং তোমার বিখ্যাত তওবা অনুষ্ঠান হয়। তওবার বিষয়টা আমি বুঝতে পারি না। তওবা

কেন? তুমি কি বড় কোনো পাপ করেছ? ভালো কথা, পানি মনে হয় গরম হয়েছে। তুমি গোসল করতে যাও।

খালেক বাথরুমের দিকে রওনা হলেন। তিনি অপ্রকৃতস্থের মতো পা ফেলছেন। এক তলা থেকে শায়লার চিৎকার করে কান্নার আওয়াজ আসছে। তার ঘরের দরজা-জানালা বন্ধু। তারপরেও আওয়াজ আসছে। বন্ধ দরজার সামনে সনজু মোড়ায় মাথা নিচু করে বসে আছে। মৃত মানুষের বাড়িতে আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেকে ভিড় করে থাকে। এই বাড়ি খালি। দুপুরে ভাড়া করা ট্যাক্সি করে দুই মহিলা এসেছিলেন। অল্প কিছুক্ষণ থেকে সেই ট্যাক্সিতেই বিদায় নিয়েছেন।

তরু বারান্দা থেকে সনজুকে ইশারায় ডাকল। সনজু আসছে। তার হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে নিতান্ত অনিচ্ছায় আসছে।

সনজু মাথা নিচু করে তরুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একবারও চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। তরু বলল, মুন্সিগঞ্জের হেমন্ত বাবুর খবর কি? উনি ভালো আছেন?

সনজু জবাব দিল না।

তরু বলল, ঘটনা কি সেই ঘটিয়েছে?

সনজু এই প্রশ্নের উত্তর দিল না।

তরু বলল, তোমার আপা একা কাঁদছেন। তুমি কাঁদছ না এটা কেমন কথা? কান্নাতেও সঙ্গী লাগে। আপার সঙ্গে কাঁদো। নকুল কান্না হলেও কাঁদো। তোমার আপা কিছুটা শান্তি পাবেন।

সনজু চলে যাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে কাঁদবে। শরীর ফুলে ফুলে উঠছে।

তরু লেখকের স্ত্রীকে টেলিফোন করল। পাঁচ মিনিটের মাথায় ভদ্রমহিলা পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন যে লেখকের কোনো দোষ নেই। বাজে একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে এই সমস্যা হয়েছে। তিনি তরুকে ক্ষমা করে দিলেন। এবং বললেন, এ রকম কাজ সে আর যেন না করে। তরু কাঁদতে কাঁদতে বলল, আর কখনো করব না ম্যাডাম।

ম্যাডাম বললেন, তুমি একদিন বাসায় এসে আমার সঙ্গে এক কাপ চা খেয়ে যাবে।

তরু বলল, জি আচ্ছা ম্যাডাম।

আমি তোমাদের মতো মেয়েদের সমস্যাটা যে বুঝি না, তা-না। বুঝি। ওর লেখা পড়ে মাথা ঠিক থাকে না। না থাকাই স্বাভাবিক। ঠিক আছে কান্না বন্ধ করো। আমি পুরোপুরি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

তরু এরপর টেলিফোন করল আনিসকে। মিষ্টি করে বলল, আমি তরু।

আনিস বলল, নাম বলতে হবে না। টেলিফোনে তোমার নাম্বার উঠেছে। বলো কি ব্যাপার।

আপনি কি আমার ছোট্ট একটা কাজ করে দেবেন?

কি কাজ?

আমার স্বামী হিসেবে পাঁচ মিনিট অভিনয় করতে পারবেন?

আনিস বলল, রহস্য করবে না। কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।

ঐ দিন যে লেখক স্যারের কাছে গিয়েছিলাম তার কাছে আবার যাব। আপনাকে নিয়ে যাব। আপনাকে দেখিয়ে লেখক স্যারকে বলব যে উনি আমার হাসবেন্ড। আমরা দুজন আপনার দোয়া নিতে এসেছি। তারপর দুজন মিলে তাকে কদমবুসি করব।

আনিস কঠিন গলায় বলল, তোমার কোনো পাগলামির সঙ্গে আমি যুক্ত থাকতে চাচ্ছি না। তুমি দয়া করে আর কখনো আমাকে টেলিফোন করবে না।

জি আচ্ছা। আংটিটা ফেরত নিতে আসবেন না?

আংটি তুমি নর্দমায় ফেলে দাও।

তরু বলল, এরকম কঠিনভাবে কথা বলছেন কেন? সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেই যে কঠিন কঠিন কথা বলতে হয় তা তো না। আমরা বন্ধুর মতো থাকতে পারি। আপনার যে কোনো সমস্যায় আমি থাকব। আমার সমস্যায় আপনি থাকবেন।

আনিস বলল, তোমার কি ঐ লেখকের কাছে যেতেই হবে?

তরু বলল, হ্যাঁ।

আনিস বলল, কখন?

বিকাল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে।

আনিস বলল, ঠিক আছে আমি আসছি। স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে আসব।

তরু বলল, সত্যিকার স্বামী হিসেবে গেলে কেমন হয়। প্রথমে আমরা দুজন কাজি অফিসে গেলাম, বিয়ে করলাম। সেখান থেকে গেলাম লেখক স্যারের কাছে। আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম উনি আমার হাসবেন্ড। এর বড় একটা সুবিধা আছে।

কি সুবিধা?

লেখক স্যারকে মিথ্যা কথা বলতে হলো না। লেখকদের কাছে মিথ্যা বললে পাপ হয়। আমি জানি আপনি রাজি না। কিন্তু একটা কথা বললেই আপনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাবেন।

আনিস অবাক হয়ে বলল, এমন কি কথা যে বললেই আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাব।

তরু বলল, কথাটা খুবই সাধারণ।

আনিস বলল, সাধারণ কথাটা শুনি?

তরু বলল, বলতে আমার লজ্জা লাগছে। তারপরেও বলি। আমি রাতে যখন ঘুমুতে যাই তখন আমার বালিশের পাশে একটা বালিশ রেখে দেই। এবং কল্পনা করি—সেখানে মাথা রেখে তুমি শুয়ে আছ।

তরু টেলিফোন ধরে আছে। ওপাশ থেকে কেউ কথা বলছে না। পৃথিবী হঠাৎ শব্দহীন হয়ে গেছে। তরু বলল, তুমি আছ না চলে গেছ?

আনিস বলল, তোমাদের বাড়ির পাশেই তো একটা কাজি অফিস আছে। আছে না?

তরু বলল, আছে। আমি কি শাড়ি পরে রেডি হব?

হ্যাঁ।

তরু কাঁদছে। ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এই কান্না মিথ্যা কান্না না। তার কান্নার শব্দে খালেক ছুটে এসে বললেন, মা কি হয়েছে?

ভুরু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, বাবা আজ আমার বিয়ে। কাজি অফিসে বিয়ে হচ্ছে। তুমি তৈরি হও। তুমি এবং পঙ্গু চাচা বিয়ের সাক্ষী।

খালেক বললেন, কার সঙ্গে বিয়ে?

তরু চোখ মুছতে মুছতে বলল, জানি না।

# ১০. কাগজ ছেঁড়ার শব্দ

কাগজ ছেঁড়ার শব্দে আনিসের ঘুম ভেঙেছে। চোখ না মেলেই সে বলল, তরু কি করছ?

তরু বলল, কাগজ ছিঁড়ছি। গল্প-উপন্যাস যা লিখেছিলাম সব কুটি কুটি।

আনিস ঘুম ঘুম চোখে একবার তাকাল। তরু চেয়ারে বসে আছে। তার সামনে মোমবাতি। সে শুধু যে কাগজ ছিড়ছে তা-না, কাগজ পুড়াচ্ছেও। আগুন ধরিয়ে টেবিলে রাখা এলুমিনিয়ামের গামলায় ফেলে দিচ্ছে। আগুনের হলুদ আভা পড়ছে তরুর চোখে-মুখে। কি সুন্দরই না তাকে লাগছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব রূপ নিয়ে বসে আছে রাঙা রাজকন্যা। আনিস বলল, লেখা ছিঁড়ে ফেলছ কেন?

তরু বলল, লেখক হবার অনেক যন্ত্রণা। কত কিছু জানতে ইচ্ছ করে। আমি এখন শুধু তোমাকেই জানব। আর কিছু জানব না। বুঝতে পারছ আমার কথা?

আনিস জবাব দিল না। তরু বলল, ঘুমিয়ে পড়েছ?

কোনো উত্তর নেই। তরু কাগজ ভেঁড়া বন্ধ করে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল আনিসের দিকে। ঘুমন্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলা খুব আনন্দের ব্যাপার। যার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে সে পাশেই আছে অথচ কিছুই শুনছে না।

তরু বলল, আমি নানান জটিলতায় বাস করেছি। এখন জটিলতামুক্ত জীবনযাপন করতে চাচ্ছি। কি জটিলতা জানতে চাও? বাবাকে নিয়ে জটিলতা। তিনি প্রতি বছর মা এবং খালার মৃত্যুদিনে তওবা করেন কেন?

পঙ্গু চাচাকে নিয়ে জটিলতা। তিনি কেন আমাকে এমন একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখতে বললেন যেখানে এক ভদ্রলোক তার দুই স্ত্রীকে হত্যা করেন। তিনি কি কিছু জানেন? পঙ্গু ভদ্রলোক এই বাড়িতে কেন পড়ে আছেন? তার অতি প্রিয় কেউ কি এই বাড়িতে বাস করে? সেই অতি প্রিয়জনটা কে? তরু নামের মেয়েটি? যাকে তিনি মিস্ট্রি ডাকেন? মেয়েটির মধ্যে রহস্য আছে এই জন্যেই কি তার নাম মিস্ট্রি? রহস্যটা কি?

এই নাই? আমার কথা শুনছ?

আনিস পাশ ফিরতে ফিরতে অস্পষ্ট গলায় বলল, হুঁ।

সুখে বাস করার সাধারণ নিয়ম জানো?

হুঁ।

তুমি ঘুমের মধ্যেই হুঁ হুঁ করছ। আমার কথা কিছু শুনছ না। শুনলেও বুঝতে পারছ না। আচ্ছা বলো তো, এমন কি হতে পারে আমি পঙ্গু ভদ্রলোকটার মেয়ে?

হুঁ।

তরু বলল, সম্ভাবনা আছে। তিনি লম্বা, গায়ের রঙ দুধে আলতায়। আমিও তাই। একজন ঔপন্যাসিকের জন্যে চমৎকার সাবজেক্ট। আমি এখন আর ঔপন্যাসিক না, কাজেই এইসব নিয়ে ভাবব না। মুন্সিগঞ্জের হেমন্ত এসেছিল। সনজু তাকে এনেছিল গান শুনাতে। তার গলা আসলেই সুন্দর। চোখ বন্ধ করে শুনলে মনে হয় হেমন্ত বাবুই গাইছেন–শিকল চরণে তার হয়েছে নূপুর। আমি মুগ্ধ হয়ে তার গান শুনেছি। একবারও জিজ্ঞেস করি নি, আপনার সঙ্গে কি ক্ষুরটা আছে? একটু দেখি তো!

আজ দুপুরে বাবাকে দেখেছি গলা নিচু করে সনজুর বোনের সঙ্গে কথা বলছেন। বাবার মুখ হাসি হাসি। ঐ মহিলার মুখ হাসি হাসি। ঐ মহিলার কোথাও যাবার জায়গা নেই বলে আমাদের সঙ্গেই থাকেন। প্রায়ই ইন্টারেস্টিং রান্না করে বাবাকে খাওয়ান। আজ দুপুরে তিনি বেঁধেছেন কলার থোড়ের বড়া। বাবা এখনো খান নি। খেলেই বলবেন–অসাধারণ।

আমার বাবাকে বলতে ইচ্ছা করে—বাবা তুমি কি এই মহিলাকে বিয়ে করবে? এবং কিছুদিন পর এই মহিলার একটি পেইনটিং আমার মা এবং খালার পেইনটিং-এর পাশে শোভা পাবে?

আমি কিছুই জিজ্ঞেস করি নি। যে তরু প্রশ্ন করত সে নেই। আমি অন্য তরু। আমার চক্ষে তৃষ্ণা। ভালোবাসায় ডুবে থাকার তৃষ্ণা। ডুব দিতে হয় চোখ বন্ধ করে। আমি চোখ বন্ধ করেছি।